সঙ-মিছিল

অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়

পরিবেশক :
জে. এন. ঘোষ এণ্ড সন্স
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৭২

প্রকাশক
শ্রীদেবকুমার বসু
১৯, পণ্ডিতিয়া টেরেস
কলিকাতা-২৯

প্রচ্ছদ
গণেশ বসু

মুদ্রক
শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী
মহামায়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৯, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

স্বনামধন্য সাহিত্যিক শ্রীযুত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

অপার-স্নেহময়েষু—

SANG MICHHIL a novel by Anil Kumar Chattopadhaya

এই উপন্যাসে গ্রথিত কাহিনীটি ইতিপূর্বে খণ্ডিতাকারে
প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুধারা, বসুমতী, চিত্রবাণী
চিত্রাংগদা প্রভৃতি পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।
প্রকাশক বন্ধু সুসাহিত্যিক শ্রীদেবকুমার বসুর
আগ্রহে ও চেষ্টায় এর এই নব-কলেবর ধারণ, এবং
সেই প্রয়োজনেই অনিবার্যভাবে কিছু যোগ-বিয়োগও
ঘটেছে।
এই কাহিনীর চরিত্রগুলি নিছক কাল্পনিক।
বাস্তবের সংগে কোনও মিল এ... শুধু আকস্মিক

অবাক লাগে মধুময়ের।

চার-চারটে বছর একটানা মধুময়ের কেটে গেছে দিনে-রাতে ওদের সঙ্গে। মিশেছে মধুময় ওদের সঙ্গে, একসঙ্গে ভাগ করে নিয়েছে হাসি আর কান্না, আনন্দ আর বেদনা। প্রথমদিকের কটা মাসের কথা বাদ দিয়ে তারপর আর কেউ ভাবতেই পারতো না যে মধুময়ও ওদের একজন নয়। যেন একই একান্নবর্তী পরিবারের মধুময়ও অন্যতম এক সদস্য। তফাৎ যতটুকু, তা নিতান্তই নগণ্য। একই পরিবারের জনে জনে যে-তফাৎ, তাই।

কিন্তু তাই কি সত্যি?

যখনই সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে মধুময়—ততবারই ও আবার খুঁজে পেয়েছে নিজেকে। ততবারই স্বীকার করেছে মধুময়, ওদের ও কেউ নয়। ওদের সঙ্গে মধুময়ের কোনও মিল নেই। সবার কাছে যেটা মিল, সেটা ওর মুখোস।

গভীর রাতে ওরা ঘুমিয়েছে। রাতের পর রাত মধুময়ের কেটে গেছে অতন্দ্র চোখে। কত রাত, তা কেউ জানেনি, জানতে পারেনি। ঘুম আসেনি মধুময়ের চোখে। সবার থেকে একান্ত বিচ্ছিন্ন করে তখন মধুময় অবসর পেয়েছে নিজের পানে তাকাবার।

শিউরে উঠেছে মধুময় প্রতিবারই।

এ কোথায় নেমেছে মধুময়? কাদের সঙ্গে নিত্যদিন ওর এই ছদ্ম-আত্মীয়তা? বহুরূপীর আখড়ার বহুরূপীদের রূপ চেনা ভার। প্রতি রাতে আর প্রতি প্রভাতে তাদের নিত্য নব রূপান্তর। মধুময়ও কি তাই স্থান মাহাত্ম্যে আখড়ার আওতায় হয়ে উঠেছে ওদেরই মতন আর এক বহুরূপী? নিত্য রাতের বিচিত্র যত চরিত্রায়ণের নেশায় ও কি নিজের সঙ্গে অভিনয় করে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চায় আখড়ার অন্যতম এক সার্থক বহুরূপী করে?

না, না, না ! ··

আঁৎকে উঠেছে মধুময়। আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে বলতে চেয়েছে ওর সর্বসত্তা : না না, ওরা আমার কেউ নয়। আমি বহুরূপী নই গো ! আমি সেই চিরকালের মধুময়। নাট্যকার মধুময়। ওদের সঙ্গে আমার কোনও মিল নেই। এতটুকুও নয় !

জীবনসায়রের উত্তাল জোয়ারে মধুময় একদিন খেয়া নিয়ে বেসামাল হয়ে পড়েছিল। দেখা হয়েছিল সেই সঙ্কট মুহূর্তে এই গোলদারী জাহাজখানার সঙ্গে। ওরা তুলে নিয়েছিল মধুময়কে নিজেদের তরীতে। কটা দিনই বা এখানে ওর পরমায়ু? আবার লগ্ন আসবে। সেদিন আর মধুময় নিজের সেই স্বচ্ছন্দ খেয়া ছেড়ে এদের এই গুমোট পরিবেশে পড়ে থাকবে না।

এলো সেই লগ্ন। চার বছর বাদে মধুময় ফিরে পেল আবার নিজের খেয়া। বিদায় নিল সে গোলদারী জাহাজের অনাত্মীয় গুমোট থেকে। ছাড়া পেলো অভিশপ্ত সেই বহুরূপীর আখড়া থেকে।

কিন্তু······বারবার মধুময়কে অবাক করে ঐ ছোট্ট একটা "কিন্তু"।

মধুময় যা ভেবেছিল, তা হোল কই?

বিচ্ছেদের পর যাদের হয়ত সামান্যতম অস্পষ্ট স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই মনে থাকবে না বলে একদিন মধুময়ের দৃঢ় ধারণা ছিল, তারা কী করে ওকে এমনভাবে অধিকার করে বসলো? ভুলতে ওদের পারছে কই মধুময়? ওদের ভুলতে হলে বুঝিবা নিজেকেও ভুলতে হয় মধুময়ের।

অথচ, আশ্চর্য !

ওরা কিন্তু বারবার প্রায় সব্বাই মধুময়কে সাবধান করেবলেছিল : মাষ্টার, ইটা বড় ছ্যাঁচড়া ঠাঁই হে। ই উঞ্ছোকর্মটি বামুন ভদ্র জনের তরে না বটে ! পার যদি, এখনি পালাও হে !

তাহলে কেন মধুময় পালিয়েও নিস্কৃতি পায় না ওদের কবল থেকে ?

ওরা মানা করেছে। মধুময় নিজেও জড়াতে চায়নি ওদের সঙ্গে। তবু কখন যে ও নিজের অজান্তেই এমন আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে গেছে! ভোলা তো যায়ই না ওদের, ওদের বাদ দিতে হলে মধুময়কে বাদ দিতে হয় নিজের অনেকখানি। অত কাছ থেকে সেদিন যা টের পায়নি মধুময় দূরে সরে এসে আজ তা ওর কাছে সুস্পষ্ট এক বিস্ময় হয়ে উঠেছে।

ওরা অনাত্মীয় নয় মধুময়ের, নয় অবাঞ্ছিতও। ওদের বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ নয় মধুময়ের নিজের ইতিহাস। মিল আছে বৈকি। সত্তায় না হোক, মিল আছে আত্মায়। মধুময়ের অনেকখানি দিয়ে ওদের পরিচয়। ওদের খণ্ড খণ্ড ভগ্নাংশে আজ মধুময়ের পরিপূর্ণতা।

একদিন ঐ বহুরূপীর আখড়ার বহুরূপীরা সবাই ছিল ওর কাছে রহস্য আর কৌতুহলের উপাদান। দিনে রাতে কতবার মধুময় দেখেছে ওদের কতরূপে অনায়াস রূপান্তর। সেটা কিন্তু শুধুই বহুরূপীর ভোল বদল। সেটা ছিল ওদের রূপায়ণ। পেশা। বড় জোর হয়তো তা কিছু শিল্পচাতুর্যের দাবী করতে পারে। কিছু বাহাদুরী আর কিছু হাততালি। মাঝে মাঝে কিছু বক্‌শিষ। আর কিছু নয়।

দেখেছে মধুময় রূপায়ণের বাইরে ওদের স্বরূপও। ক্লেদাক্ত, পঙ্কিল সে স্বরূপ দেখে ও শিটিয়ে উঠেছে বারবার, সর্বাঙ্গ ওর ঘিন্ ঘিন্ করেছে। অতি সন্তর্পনে নিশিদিন ও নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে চেয়েছে সে স্বরূপের বিষাক্ত ছোঁয়াচ থেকে।

আর আজ ?

আজ ওরা সেই কতশত রূপ আর স্বরূপ নিয়ে প্রত্যেকে অপরূপ হয়ে ধরা দিয়েছে ওর অদৃশ্য তৃতীয় নয়নে। মনের অ্যালবামে ইন্দ্রধনুর সাতটা রঙে রঙীন হয়ে ঠাঁই নিয়েছে সেই অপরূপেরা

অবিস্মরণীয় বর্ণালী সমারোহে।

ওদের ভোলা যায় না। চোখ ফিরিয়ে আজ আর থাকা চলে না ওদের দিক থেকে।

নাট্যকার মধুময়ের কলমের আঁচড়ে প্রাণময় হয়ে উঠেছে কত বিচিত্র চরিত্র। ঐ বহুরূপীদের নগণ্যতম অপরূপটির কাছেও কিন্তু সলজ্জে হার মেনেছে মধুময়ের সেই অনুপম যত সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতমটিও।

কত মানুষের মিছিল আর কত অজানারে জানা।

চিন্তা মাত্রেই মধুময়ের মনের অ্যালবাম থেকে নেমে ঐ অপ-রূপেরা বিচিত্রতম যত আলোছায়ায় অনন্য হয়ে, জীবন্ত হয়ে, ভিড় করে ঘিরে দাঁড়ায় ওকে।

কাকে ছেড়ে কার দিকে আগে তাকাবে মধুময়? কাকে বড় করে কাকে তুচ্ছ ভাববে? ওরা যে সবাই অপরূপ। কত দিনের কথা। তবু কেউ ওরা ফিকে নয়। ঝাপসা নয়। পর নয়। দূরে নয়। কাছে। অতি কাছে। দুচোখ ভরে মধুময় ওদের আশ মিটিয়ে দেখে আর দেখে। নিজের দেহের ওপর প্রতি মুহূর্তে মধুময় অনুভব করে ওদের শ্বাসপ্রশ্বাসের জীবন্ত ছোঁয়া। হাত বাড়ালেই যেন কাছে পাওয়া যায়। এসেছে ওরা সবাই।

...কালী ধাড়া।...লালু ঘোষ।...বটুকদাস।...ব্রজরাণী।... ললিতাসখী।...টনশা।...তবল্চি বামাপদ।...নটদিবাকর প্রভাস ঘোষ।...চুণী।...ছোট আর বড় ননী।...দুর্বাসা মুখুজ্যে।...সুবলি। ...মাষ্টার হরিচরণ।...

সব্বাই। সব্বাই।

অবিস্মৃত অতীত প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে মধুময়ের চোখের সামনে।

যেন অদৃশ্য এক পর্দার বুকে চলমান বায়োস্কোপের ছবি। সুস্পষ্ট। মুখর। জীবন্ত।

রাঢ় প্রদেশের রুক্ষ গৈরিক অসম প্রান্তরের ওপর দিয়ে সার সার চলেছে খান বারো গরুর গাড়ি। পিছু পিছু তিন খানায় বিরাট আকারের গোটাকয়েক বাক্স আর পেট মোটা বস্তা বোঝাই। বাকি ক'টাতে মানুষ, স্যুটকেশ, আর শতরঞ্চী-জড়ানো দড়ি বাঁধা ছোট-বড়-মাঝারি নানান আকারের বেডিং এর ঠাসাঠাসি।

গাড়ির পাশে সঙ্কীর্ণ পথের অবশিষ্টাংশ ধরে গোটা পাঁচেক দলে ভাগ হয়ে হেঁটে চলেছে জন ষোলো লোক।

গৈরিক ধূলার প্রলেপে মানুষ-গরু-গাড়ি সব হয়ে উঠেছে গৈরিকাভ। উপরে আকাশের পশ্চিম দিগন্তে গৈরিকাভা। সূর্য অস্ত গেছে। অসীম নীলিমে রেখে গেছে তার শেষ মুঠো রঙীন আশীর্বাদ।

যাত্রার দল চলেছে গ্রামে। কোলকাতার নাম-করা পেশাদার দল। এক হপ্তা গান হবে। মাঠটা পেরোলেই ধর্মরাজতলা। মেলা বসছে সেখানে। তারপরেই গ্রাম।

দূরাগত ধ্বনি ভেসে আসছে মেলাতলা থেকে। দেখা যাচ্ছে টিমটিমে আলোর সার। বুঝি শেষ হোল পথ।

মানুষগুলো উল্লাসিত হয় ওঠে। জানোয়ারগুলোও। পা চলে জোর কদমে।

থেকে থেকে এক একজন গাড়োয়ান তার বাহনগুলোর লেজ ম'লে তাড়া দেয়ঃ হিই-ই-ই! হ্যাট্…হ্যাট্…হ্যাট্…!

পৌঁছে গেল দল মেলাতলায়।

পাশ দিয়ে গাঁয়ে ঢোকার সরু মেটে রাস্তা। গাড়িগুলো মোড় নিল সেদিকে। মানুষ কিন্তু অনেকেই নেমে পড়লো সেখানে। মেলা দেখবে।

চাঞ্চল্য দেখা দিল মেলাতলার এ পাশের ভগ্নাংশটুকুতে। চকিতে চঞ্চল হয়ে উঠলো তারা। চোখ বড় বড় করে পরম কৌতুহলে তারা

দেখতে লাগলো ওদের। তাদের কাছে যাত্রাদলের প্রতিটি লোকই যেন কোন্ এক রূপকথার বাসিন্দা। রাতে ডে-লাইটের আলোয় ঝল্‌মলে পোষাকে এরাই হয়ে ওঠে কান্তিমান যত রাজা, সেনাপতি রাজপুত্তুর, আর ভয়াবহ অসুর, দানব, রাক্ষস। গ্রামীণদের কাছে সত্য এদের সেই রূপটাই। ছদ্মবেশ আর অভিনয়ের বাইরে যে-রূপ, আসলে যেটা ওদের সত্যরূপ, সেটাই যেন এদের কাছে মিথ্যে, রূপকথার রাজপুত্তুরদের ছদ্মবেশ।

সারাটা বছর এরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে এই দিন কটার। এদের বৈচিত্রবিহীন নিস্তরঙ্গ অসংখ্য মরু দিনাতিপাতের মাঝে তৃষিত কামনার সরস মরু-মালঞ্চ-বিলাস।

ঃ হিঃ রে, দল আইছে বটে !

সোরগোল পড়ে যায়। ভিড় জমে ওঠে। এক পলক দেখার জন্যে ঠেলাঠেলি। কাছে কিন্তু ঘেঁসে না কেউ। বিলক্ষণ একটা ব্যবধান ঠিক বজায় থাকে। কাছে ঘেঁষতে হয়তো সাহস পায় না এরা। ভয় করে এই সব রূপকথার বাসিন্দাদের, সমীহ করে অপার।

রূপকথার মানুষগুলো তা জানে। তাই গ্রাম্য মানুষগুলোকে দেখলেই ওরা গম্ভীর হয়ে যায় মুহূর্ত্তে। পদোচিত স্বাতন্ত্র ঘোষণা।

অনেক জোড়া বিস্মিত চোখের ওপর দিয়ে ওরা ঢোকে মেলা তলায়।···

বিচিত্র এই অঞ্চলের মেলাগুলো।

যাত্রাদলের সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। কখনও আগু। কখনও একই সঙ্গে।

মেলা বসে খোলা মাঠে।

গোটাকতক মাত্র দর্মার ঘর। ভিড়ের অনুপাতে পণ্য বা পশারি কিছুই নয়। হয়তো একটা নাগরদোলা, গোটাকয়েক সস্তা মনোহারী দোকান, আর মিষ্টির দোকান ক'টা। "মিষ্টি" অর্থে সন্দেশ-রসগোল্লা প্রায়শই নয়। বাতাসা, মুড়কি, আর তেলেভাজা জিলিপি। এতেই

যায় মেলাতলার ছুটো দিক।

বাকি ছুটো-দিকের একধারে থাকে পাশাপাশি দু'সারি অস্থায়ী ঘর। একটা সারিতে বিভিন্ন জুয়ার আড্ডা। বালাখেলা। তীর-নিশান। টেক্কা-তাজ। রঙের ধাঁধা।

অন্য সারিটা ভাঁটিখানা। চোলাই মদ বা "কাঁচি"-র সস্তা কেন্দ্র। ভিড় সবচেয়ে বেশি হয় এই দিকটাতেই। মাতামাতি। চিৎকার। উল্লাস। ঠেলাঠেলি। খিস্তি। মাত্‌লামী।

জুয়ায় মাতাল। মদেও মাতাল।

শেষ দিকটায়—অপেক্ষাকৃত দূরে—অনুরূপ আর এক সারি পাশাপাশি ঘর। প্রত্যেকটা ঘর একই মাপের। অন্দর-সদরেব হালও প্রায় এক। দরজা নেই কোনটারই। দর্মার ঝাঁপ। খোলা থাকলে, স্পষ্ট দেখা যায় ভেতরটা। আসবাবপত্র অতি সামান্য। অসমতল মাঠের বুকে ঘরের একপাশে খান ছুই তিন দর্মার ওপর হয়তো একটা ছেঁড়া তেলচিটে বিছানা পাতা, মাটির একটা গামলায় জল, নোংরা ছোট্ট গাম্‌ছা একখানা, আর একটা সধূম কেরোসিনের ডিবে। ব্যস্‌, আর কিচ্ছু নয়।

ঘরের বাইরে খোলা ঝাঁপের পাশে অন্ধকারে হয়তো একটা মোড়া, নয়তো একটা ভাঙা প্যাকিং-কাঠের বাক্সের ওপর বসে বসে বিড়ি টানে একটি করে মেয়ে।

পণ্যা। লোকবধূ।

বেশির ভাগই আদিবাসী বা বাউরি ললনা।

কুচ্‌কুচে কালো রঙ। অন্ধকারে মুখটা ভাল করে দেখা যায় না। কাছে এগিয়ে খুঁটিয়ে যাচাই করলে তবে টের পাওয়া যায়।

কাছে গিয়ে একটা দেশলাই-কাঠি জ্বালো। রাগ করবে না ওরা, গাল দেবে না। খিল্‌খিলিয়ে হাসবে। চাইকি কেউ হয় তো অকস্মাৎ-স্খলিত-প্রায় হ্রস্ব বক্ষোবাস গুছানোর ছলে তোমার যাচাইয়ে প্রত্যক্ষ সহায়তাই করবে।

কালো। মেঘবর্ণা। মাথা থেকে পিঠ বেয়ে নেমেছে একঢাল কৃষ্ণকুঞ্চিত কেশদাম, যেন নীলাকাশে থরেথরে শাওন মেঘাড়ম্বর। আয়ত ছ'টি হরিণচোখে চকিত বিদ্যুৎ। সুতনুকা। মক্ষীকটি। উর্ধাঙ্গে যুগ্ম মৈনাকের তুঙ্গ স্পর্ধায় সুডৌল বিদ্রোহী যুগ্ম-প্রাণোৎস। ওদের বরাঙ্গে নেই সহরের প্রসাধন। নেই ম্যাস্ক্-ফ্যাক্টর আর দর্জির কেরামতি, নেই কোনখানে রবার-প্যাডের ইন্দ্রজাল। নেই সায়া, ব্লাউজ, চোলি, ব্রেসিয়ার আর করসেটের কারচুপি। শুধু পরণে একখানা ন' হাতি মোটা হ্রস্ব-ঝুল শাড়ি, আর কানে-চুলে-গলায় কুটি-স্তবকের সুমোহন বিন্যাস।

মনে মনে স্বীকার করতেই হবে, পণ্যা হওয়ার দম্ভ ওদেরই সাজে। সর্বাঙ্গে উপচে পড়ছে পণ্যভার। নিঃসীম প্রাণপ্রাচুর্যে কৃষ্ণতনু থরথর, টলমল,—ভারাবনত। বিলিয়েছে। ছড়িয়েছে। অপচয় করেছে যথেষ্ট বেহিসেবে। তবু টান পড়েনি ভাঁড়ারে। পূর্ণ আছে সেই প্রথম দিনটির মতন। থাকবেও হয়তো আমরণ। হয়তো ব্যথা বাজবে বুকে। নারীর অপমানে না হোক, অপাত্রে অপচয়ে। যা হতে পারতো যে কোনও শিল্পীর কাছে পরম কাম্য, প্রকৃষ্ট প্রেরণা, তাই ফিরি হচ্ছে প্রকাশ্য নীলামে,—খাসীর মাংসের চেয়েও অনেক সস্তা দরে।

দর এদের বিস্ময়করভাবে সত্যিই সস্তা।

ক্রেতা এসে দাঁড়ায়। দরদস্তুর চলে। হাত ধরাধরি করে ছ'-জনায় অদৃশ্য হয় ঘরের মধ্যে। ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যায় ভেতর থেকে। হয়তো আধঘণ্টা, কিছু কমবেশি। আবার ঝাঁপ খুলে যায়। বার হয়ে আসে ছ'জনায়। বিশ্রস্তবাস। হাঁফাচ্ছে। হাস্ছেও। পুরুষ বিদায় নেয়। অন্য পুরুষ আসে। আবার ঝাঁপ বন্ধ হয়। আবার। আবার।···

সন্ধ্যে থেকে সুরু করে সারাটা রাত চলে ঐ একই দৃশ্যের পৌণঃ-পুণিক আবর্তন।

যাত্রাগানের খরচ ওঠে প্রধানতঃ এই শেষ তিন সারির ওপর ধার্য

"পালা", "ডাক" বা কর থেকে।...

যাত্রাপার্টির জনচারেকের একটা দল হৈ-হৈ করতে করতে এসে পড়লো পণ্যা-বিপনির দিকটাতে। তিনজনে মিলে সকলবলে ঠেলে আনছে অনিচ্ছুক এক চতুর্থজনকে।

ঃ না হে মাষ্টার, আজ তুমার ছাড়ান নাই হে।

ঃ আহা, খেয়্যে তো আর তুমারে ফেলিবে নাই। ভয়টি কিসের তবে ?

ঃ জন্মভোর তো নিরামিষ খেয়্যে কাটাইছ। হাড়মাস একটু চেখ্যেই কেনে দেখ একটিবার।

দল কোলকাতার। দলের মানুষগুলো কিন্তু বেশির ভাগই বাঁকুড়া, মেদিনীপুর আর দক্ষিণ-বাংলার অধিবাসী। তাই হয়। পেশাদার যাত্রাদলের রত্নভাণ্ডার আছে চিরটাকাল নাকি ঐ ক'টা অঞ্চলেই।

যাকে এত ঠেলাঠেলি, তুলনায় এবং একনজরে তাকেই সবচেয়ে শিক্ষিত আর ভদ্র বলে মনে হয়। হওয়া স্বাভাবিক। আসলেও তাই।

নাম তার মধুময়। ভদ্রবংশের শিক্ষিত ছেলে। পেটের দায়ে নাচার হয়ে দলে ঢুকেছে। নবাগত। এখনও বছর কাটেনি। এদের রীতি তাই আজও মধুময়ের ধাতস্ত হয়নি পুরোপুরি। বাধো-বাধো ঠেকে। তবে খাতির আছে। সে খাতির প্রধানতঃ ওর বিদ্যা আর আভিজাত্যের জন্যে। তার ওপর ও আবার দলের জন্যে একখানা পালা লিখে দিয়েছে। সে-পালা ডেকেওছে খুব।

এরা ডাকে ওকে "মাষ্টার" বলে। পেশাদার যাত্রাদলে ও-খেতাবটি একমাত্র গুণী-জ্ঞানী-মাননীয়দের প্রসঙ্গেই প্রযোজ্য।

দলের আর তিনজন হোল নাচিয়ে খগ্না, বিদুষক গোপ্লা, আর বিবেক কালী ধাড়া। কালী ধাড়াই বয়োজ্যেষ্ঠ আর দলের পাণ্ডাও। বয়েস পঞ্চাশের ওপর। ষণ্ডামার্কা লম্বা-চওড়া দেহ। কালো। মুখখানায় অসংখ্য বসন্ত-লাঞ্ছন। কুৎকুতে রাঙা ছুটো

চোখ। গানের গলার মতন অন্যান্য গুণাবলীর জন্যেও সে দলের মধ্যে অনন্য। হেন নেশা নেই যা করে না। নেশা কিন্তু হয়না তার। লাল লাল চোখদুটো শুধু আরও লাল হয়। অরুচি নেই কোনও নেশায়। রুচিটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি মেয়েমানুষে। চোখের দেখা বা কারও মুখে আলোচনা শুনতে যা দেরি। ক্ষুদে ক্ষুদে চোখদুটো তার চক্‌চক্ করে ওঠে। নাকটা ঘনঘন কোঁচকায় আর ফুলে ফুলে ওঠে। সশব্দে ঝোল টানে মুখে। অপার, অতৃপ্ত লালসা তার নারীদেহে। যেন পাগল হয়ে যায়।

জেলা বাঁকুড়ার কোন্ এক গাঁয়ে নাকি কালী ধাড়ার জন্মস্থান। এখন আর তিনকুলে কেউ নেই। তাই নেইও তার কোন আগল-বাঁধন সংযমও।

গ্রাহ্যই করে না ওরা মধুময়ের যত আপত্তি। নবাগত হলেও অন্যসময়ে ওরা তাকে যত সমীহ করে চলে, এখন ফুর্তির জোয়ারে তা ভেসে যায়। জোর করে ঠেলে আনে ওকে।

পণ্যারা ক্রেতার প্রত্যাশায় উৎসুক হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিল।

সামনে যাকে পায় তাকেই জিজ্ঞাসা করে কালী—কী ভাই, কেমন চলিছে বটে?

অন্ধকারে কালোমুখের আড়াল থেকে ঝিলিক মারে দু'পাটি শাদা দাঁত।

সদীর্ঘশ্বাসে উদ্দিষ্টা বলে ওঠে: তুমার বিহনে মনটিতে সুখ নাই হে প্রিয়। পথ চেয়্যে চেয়্যে চক্ষু দুটি অন্ধ হইছে বটে।

পরক্ষণেই খিল্‌খিলিয়ে হেসে উঠে আমন্ত্রণ জানায়: এসো না কেনে গো মোর কুঞ্জটিতে।

: দর্শনীটি শুনাও দিকি আগে।

: একা, না চারজনাই?

: থাউকো দরটিই কত শুনি।

মেয়েটি ক্ষণেক কী যেন ভাবে। মনে মনে হয়তো একটা ত্বরিত

হিসাব খতিয়ে নেয়।

তারপর বলে ঃ দরটি আর কী করিব হে নাগর তুমার সাথে? দিও কেনে চারজনায় চারটি ট্যাকা।

ঃ এ্যাঁ! চমকে ওঠে কালী।

তারপর হো-হো করে হাসতে হাসতে বলে ঃ কও কি মণি? চার ট্যাকা? না ভাই, তুমার দেখি ভাব-ভালবাসায় মনটি নাই।

খদ্দের ফিরে যাওয়ার আশঙ্কায় ত্রস্তকণ্ঠে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে ঃ তা রাগ করিছ কেনে হে নাগর? কওনা কেনে, তুমরা কতো দিবে?

ঃ কই?

ঃ কও।

ঃ রাগ করিবে নাই তো?

আবার হাসে মেয়েটি। সেই উচ্ছল হাসি। ঝরে ঝরে পড়ে চিরন্তনী মোহময়ী।

বলে ঃ রাগ? তুমার 'পরে? হারে নাগর, তুমায় মাথার চুড়া ধরিল্যে ভাগ্যিমনির মাথাটি ধন্য হবে যি গো!

ঃ শুন তবে ভাই মৌটুসী।—গড়গড় করে বলে চলে কালী ধাড়া ঃ কলকাত্তায় মোরা পাই ট্যাকায় চারটি কর‍্যে। তুমারে নাহয় আরও অষ্টগণ্ডা বকশিস দিব, অ্যাঁ?

চমকে ওঠে মধুময়। কথা শুনে কাঠ হয়ে যায়।

···এরা কারা? দর করছে কীসের?···মানুষের?···বাজারের আম-কাঁঠালের মতন টাকায় কটা তারই হিসেব করে?···মানুষ— অমৃতস্য পুত্রাঃ—এত সস্তা তার দাম?···কবে থেকে হোল?···কারা নামালো এমন করে?···

সঙ্গীদের কথাবার্তার ফাঁকে মধুময় পিছিয়ে দাঁড়িয়েছিল একটা ঝাঁকড়া বাব্‌লা গাছের ছায়া ঘেঁষে। নিজেদের রসিকতায় তখন তারা মশগুল। ওর দিকে লক্ষ্য নেই। অবসর বুঝে পা টিপে টিপে পালাতে থাকে মধুময়। দাঁড়াতে পারছে না আর। দম বন্ধ হয়ে

আসছে। কানে কে যেন তপ্ত শীষে ঢেলে দিচ্ছে।

পায়ে পায়ে খানিকটা এগিয়ে যায় মধুময়। পিছন থেকে হঠাৎ ভেসে আসে সঙ্গীদের উচ্চ হাস্যরোল। হয়তো তারা রসিকতা করছে মেয়েটির সঙ্গে। হাসি তো নয়। যেন বন্য একটা হিংস্র ঘৃণ্য জানোয়ার তাড়া করেছে পিছন থেকে।

আরও জোরে পা চালায় মধুময়।

ঃ অ' বাবু!

মেয়েলী ডাক। আশঙ্কায় নীল হয়ে ওঠে মধুময়। সেদিকে একটিবারও দৃক্‌পাত না করে হন্‌হনিয়ে ও এগোতে চায়।

ঃ বাবু গো! হেই গো বড়বাবু!

ডাক এবার কাছেই। পাশেই।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে মধুময়। মেয়েটিও সামনে এসে পথরোধ করে দাঁড়ায়। দূরাগত এক ঝলক আলো এসে পড়েছে তার মুখে। বিস্মিত হয় মধুময়। সাজসজ্জা থেকে তার পেশাটা আন্দাজ করে নিতে ওর কষ্ট হয় না। তবুও যেন তফাৎ আছে ওদের সঙ্গে। রূপের চেয়ে লাবণ্য বেশি। বয়েসও কম। বড়জোর বছর কুড়ি। গায়ের রঙটাও ওদের তুলনায় অনেক মাজা।

মুহূর্তে চোখ নামিয়ে সকুণ্ঠে মধুময় বলে ঃ না না, আমি নয়।

ঃ সিটা আমি বুঝি বাবু গো।—মেয়েটিও এবার ডাগর ভীরু চোখদুটি নামিয়ে বলে ঃ আমি তুমায় বাঁধিতে আসি নাই।

ঃ তবে?

ঃ একটি কথা তুমায় শুধাবো?

ঃ কী কথা?

বিস্মিত হয় মধুময় মেয়েটির আচরণে।

ঃ উয়ার নামটি কী গো? হুই যে তুমাদের দলের মানুষটি—মোটা পারা—মুখটিতে রইছে মায়ের দয়ার ছাপছোপ?

ঃ কালী ধাড়া? কেন বলোতো?

জবাব দেয়না মেয়েটি। চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। ভীষণ অস্বস্তি বোধ করতে থাকে মধুময়। কথাও বলতে পারে না কিছু। জানেই না ও কীভাবে কথা বলতে হয় এদের সঙ্গে! লজ্জা আর সঙ্কোচ ওকে ছেঁকে ধরে। কেউ যদি দেখেশুনে ফেলে ?···.

ঃ আর একটি উপকার আমার করিবে বাবুগো ?—চাপা মিনতি-ভরাকণ্ঠে এবার অনুরোধ জানায় মেয়েটি ঃ উয়ারে একটিবার আমার কাছে পাঠায়্যে দিবে ?

ঃ কী বলবো ?

ঃ কইবে যে ছ'লম্বরের ঘরের মেয়্যেটি উয়ারে একটি দেখা দিতে কইছে। তাড়া নাই। য্যাখন ফুরসুৎ হবে, ত্যাখন।

ঃ বেশ বলবো।

কথা শেষে আবার ত্রস্তে পা বাড়াতে চায় মধুময়।

মেয়েটি আবার সকরুণ আকুতি জানায় ঃ মোর মাথার কিরা বাবু গো, কয়্যো মনে করে। তুমারে দিবার কিছু নাই মোর। তাই নিয়ে যাও আবাগীর ই প্রেণামটি।

বাধা দেবার অবকাশ পায় না মধুময়। ঝাঁ করে মেয়েটি নুয়ে পড়ে ওর পায়ের কাছে।

সহসা আবার কী যেন মনে করে হাত বাড়িয়েও টেনে নেয় সে-হাত।

ঘাড়টা তির্যকভাবে তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করে ঃ তুমার জাতটি কী বটে বাবু গো ?

ঃ ব্রাহ্মণ।

চমকে ছটকে সরে দাঁড়ায় মেয়েটি। যেন সাপ দেখেছে সামনে।

ঃ দেবতা ? ক্ষ্যামা কর‍্যো গো দেবতা। বুঝিতে পারি নাই। উই ছিচরণে হাত রাখিবার ভাগ্যি মোর কুনদিন হবে নাই গো দেবতা। সি বরাত না ই পোড়াকপালীর।

মাঠ থেকে এক চিমটি সিঁদুরে মাটি তুলে নিয়ে পরম ভক্তিভরে

মেয়েটি মাথায় রাখে। তারপর দ্রুতপায়ে ফিরে চলে সে নিজের কোঠরের দিকে।

শুধু বলে যায়ঃ ভুলো নাই যেন দেবতা।

ঘন আঁধারে মিলিয়ে যায় মেয়েটি দর্মাঘরের সারির দিকে।

ঠিক বুঝতে পারে না মধুময়। মেয়েটির শেষ অনুরোধে ও যেন থরথর কান্নার আভাস পায়। বুঝতে পারে না ও আগাগোড়া কিছুই। বিস্ময় ওর সীমা ছাড়াতে চায়।…

বলেছিল মধুময় কালীধাড়াকে খবরটা ঘণ্টাখানেক পরে।

শুনতে শুনতে চক্‌চক্ করে উঠেছিল কালীর কুৎকুতে লাল চোখদুটো। লোভে লালসায় আর উত্তেজনায় বীভৎস হয়ে উঠেছিল তার বসন্ত বিকৃত মুখখানা।

বার হয়ে গিয়েছিল তখনই সেই ছ'নম্বরের খোঁজে।

বাধা দেবার চেষ্টায় মধুময় তবু বলেছিল : এখুনি চললে ?

ঃ হাঁ হে, শুভকর্মে দেরি করিতে নাই।

ঃ গান আরম্ভ হবে যে।

যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে জবাব দিয়েছিল কালী ধাড়া ঃ গানের এ্যাখুনও যত বিলম্ব রইছে বটে তার ভিতরে একটি না হে, কালীধাড়া একপণ মেয়্যের মওড়া নিয়্যে ফিরে আসিতে পারে মাষ্টার।

গানের আগে যথাসময়েই ফিরে এলো কালী। অন্যরূপে।

গিয়েছিল প্রাণচঞ্চল। ফিরে এলো নিস্প্রাণ, বিমর্ষ।

বিবেকের গান বাদ গেল না কোনখানাই। গাইল কালী সব কটাই। জমলো না। ভাষার সঙ্গে ঘটলো না মিতালী, সুরে-তালে ছাড়াছাড়ি।

অবাক হোল সবাই। এমনটা শুধু বিস্ময়করই নয়, অভূতপূর্ব।

কারণটা জানতে চাইল অনেকেই। সাড়া পেল না কেউ। কালী

শুধু গিলে চললো ভাঁড়ের পর ভাঁড় ভর্তি "কাঁচি"। কুৎকুতে রক্তাভ চোখ দুটো তার হয়ে উঠলো পাকা করমচার মতন।

ছুটে এলো ম্যানেজার-অধিকারী বটুকদাস।

খিঁচিয়ে বললো: তুমার ব্যাপারটি কী বটে হে কালী? ডুবাবে নাকি গোটা দলটিকে? ইগুলা তুমার গান হইছে, না মোর পিণ্ডির মন্ত্রপাঠ হে?

কালী ধাড়া কোনও জবাব দেয় না। ঘাড় নিচু করে নীরবে আনমনা বসে থাকে। কথাগুলো যে তার কানে ঢুকছে তেমন কোন লক্ষণও প্রকাশ পায় না।

বটুকদাসের রাগ আরও বেড়ে যায়।

গলা চড়িয়ে হুঙ্কার ছাড়ে: তারপর? গানের ট্যাকাটি য্যাখন দিবে নাই? য্যাখন তার 'পরে আবার ঢোল-তবলা-সাজপোষাকগুলা কেড়্যে নিবে? ত্যাখন খেসারৎটি কে দিবে বাপ? ইতগুলা মানুষের ঠিকা-রোজগণ্ডাটি আমি দিবা কুথা থেক্যে হে?

কুৎকুতে লাল চোখদুটোকে একবারমাত্র তুলে ধরে বটুকদাসকে দেখে নেয় কালী ধাড়া।

তারপর আবার মাথা নিচু করে বিরক্তিভরে গুমরে ওঠে: ছাড়ায়্যে দাও না কেনে আমারে, ব্যস্! কানের পাশে অমন ধাবা শকুন-টিক্‌টিক্ কর্য্যো নাই অধিকারী। যাও।

চুপ করে যায় বটুকদাস। আর ঘাঁটাতে সাহস পায় না।

শেষে যদি সত্যিই কালীধাড়া দল ছেড়ে চলে যায়?···নাম করা গাইয়ে। বহু জায়গায় বায়না হয় তার নামে। বাপরে!···

শেষের দিকে একটা দৃশ্যে অভিনয় করতে করতে হঠাৎ মধুময়ের নজর পড়ে মেয়েদের দিকটায়। চমকে ওঠে মধুময়।

বসে আছে সেই মেয়েটি। একেবারে সামনে। প্রথম সারিতে। এক সাজ। একই শাড়ি।

দিন দুয়েকের মধ্যে দলের কারও আর জানতে বাকি থাকে না।

সুরু হয়ে যায় চোখঠারা, সরস টিকা-টিপ্পনী, আর রসালো আলোচনা ওদেরই দলের কালী ধাড়া আর একটি অচেনা দেহ-পশারিনীকে নিয়ে।

এমন ঘটনা দলে হামেশাই ঘটে। বিশেষতঃ কালীধাড়ার কীর্তির তো কথাই নেই। নূতনত্ব কিছু নেই এতে, নেই কোনও চমকপ্রদ বৈচিত্রও। তবু আলোচনা চলে। এমনিই চলে চিরকাল। যখন যার পালা, তাকেই উপলক্ষ করে। এমনি ধারাই ওদের স্বভাব! কী যেন একটা পাশব আনন্দ পায় ওরা এমনিধারা পঙ্কালোচনায়।

মধুময় কোনদিন যোগ দিতে পারে না এসব আলোচনায়। তবু কানে ওর যায়ই। অনেক সময়ে ওরা জোর করে ধরে-বেঁধেও শোনায়।

গা ঘিন্-ঘিন্ করে ওঠে মধুময়ের। বাধে তার ভদ্ররুচিতে। ভাবে আর ভাবে।

ভেবে ভেবে মধুময় একটাই মাত্র সিদ্ধান্ত খুঁজে পায়।

ঘরছাড়া, আত্মীয়ছাড়া, সুদীর্ঘকাল নারীসঙ্গ-বর্জিত একদল বঞ্চিত উপবাসী। খাদ্য জোটে না, তাই বোধহয় রসালো খাদ্যের মুখরোচক আলোচনায় পরিতৃপ্তির প্রয়াস পায়। চাওয়া আর পাওয়ার মাঝে খিস্তি আর কুৎসিত আলোচনায় এক অদৃশ্য সেতু রচনা করে দূরকে সান্নিধ্যে টেনে অব্যক্ত এক পাশব উপভোগ-লিপ্সা।

যাকে নিয়ে এত আলোচনা, সেই কালী ধাড়াকে কিন্তু শুধু গানের সময়টুকু ছাড়া দলের ত্রিসীমানায় আর খুঁজে পাওয়া যায় না। খেতে, ঘুমোতেও নয়। আসে যখন, মদ গিলে চুরচুরে হয়েই আসে। তার ওপর আরও খায়। কথা বলে না কারও সঙ্গে। শুধু মাঝে মাঝে যা দু-একটা একমাত্র মধুময়েরই সঙ্গে।

মেয়েটিও আসে রোজ রাতে যাত্রাগান শুনতে। বসে ঠিক সেই একই জায়গাটিতে।

বটুকদাস গজ্‌গজ্‌ করেঃ ডুবাবে! ই একজনা লাটসাহেবের ছাতার বাঁটই নির্ঘাৎ ডুবাবে মোর দলটিকে!

মধুময়কে কাছে পেলে বলেঃ হুঁসিয়ার মাষ্টার! বামুণ-ভদ্দরজন তুমি, দলে আসিছ, সিটা বহু ভাগ্য মোদের। তুমিও যেন মোর পোড়াবদনটি আরও পুড়ায়্যো না হে। ই শালা গানের দলটি হইছে অতি বদ আস্তানা। আর সঙ্গদোষটিও বড় মারাত্মক চিজ বটে। খুব হুঁসিয়ার!···

সেদিন রাতে কিন্তু ঘটলো ব্যতিক্রম।

গান সুরু হতে তখন আর আধঘণ্টাটাক মাত্র দেরি। ফিরলো না কালীধাড়া।

আশঙ্কায় আকুল হয়ে উঠলো বটুকদাস।

মুখে শুধু তার এক বুলিঃ লাও হে! হইছে তো? ফলিল কিনা মোর বাক্যটি? ডুবালো কিনা গোটা দলটিকে ই মোর সুমুন্দির বিবেক?

কোথায় গেছে কালীধাড়া, সেটা কারও অজানা নয়। একমাত্র মধুময় ছাড়া আর কেউ কিন্তু জানে না কোন্‌ ঘরটিতে তার আস্তানা?

বিদুষক গোপ্‌লা বলেঃ যাই না কেনে, ধর্যে নিয়ে আসি কালীরে।

চীৎকার করে খিঁচিয়ে ওঠে বটুকদাসঃ তা আর নয় হে? বিবেকটি তো গেছেই বটে। ইবার সিটারে খুঁজিতে বারায়্যে বিদু-ষকটিও সেঁধোক না কেনে আর এক কোকরে। ব্যস্‌ তারে খুঁজিতে সেনাপতিটি যাক্‌, সেনাপতিটির তরে মন্ত্রী, মন্ত্রীর তরে রাজা,—যাক্‌ দলটি মোর ফাঁকা হয়ে যাক্‌! আমি শালা একা হেথা হুই ভোঁতা তলোয়ারটি গলায় বসায়্যে মনের আনন্দে আত্মহত্যি হই। চুকে যাক্‌ ল্যাঠাটি।

অত কথা শোনার দরকার হয়নি গোপলার। অপেক্ষাও করেনি

বেচারা ধৈর্য ধরে। মুখপাতটুকু চেখেই সে নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে গিয়েছিল নিজের সীটে। একমনে সুরু করে দিয়েছিল নিজের রঙকাম।

বটুকদাস থামতেই নাচিয়ে খগ্‌না মেয়েলী ঢঙে সর্বাঙ্গে দোলা তুলে দমক দিয়ে বলে ওঠেঃ ই মুখপোড়া গোপলার কথাটি তুমি ছাড়ান দাও না কেনে দাসমশাই। ই হাবাতে জানে নাকি যে কুন্‌ ঘরে কুন্‌ বিদ্যাধরীর পাশে ভিড়িছে বটে তুমার বিবেকটি? কুথায় খুজতে কুথায় সেঁধোবে তুমার গোপলা, সারাটি অঙ্গে পীরিতের নীলবড়ি মেড়্যে দিবে বাব্‌লা-ছড়ি পিটায়্যে—হঁ।!

কথাটা এতক্ষণে খেয়াল হয় সব্বার। মধুময়ের ইচ্ছে হয় একবার ঘরের ঠিকানাটা ফাঁস করে দেবার। দেয় না একটা আশঙ্কায়। যদি ওকেই পাঠাতে চায়?···

খোঁড়ার পা খন্দে পড়ে ঠিকই!

অকস্মাৎ বটুকদাস ওকে ধরে বসেঃ হেই মাষ্টার, মোরে বাঁচাও হে! উই শালা মোর চোদ্দপুরুষটিরে পাকড়ায়্যে আন মাষ্টার।

ঃ আমি?

সশঙ্কে কেঁপে ওঠে মধুময়।

আর কিছু ওকে বলার অবকাশ না দিয়ে বটুকদাস খপ করে ওর হাতদুটো চেপে ধরে সকরুণ মিনতি জানায়ঃ তুমি বিনা ই-দলের আর কুনও সুমুন্দিরে মোর বিশ্বাস নাই হে। না-টি কর্য়ো নাই মাষ্টার। তুমি পারিবে। মান রাখ হে আজ আমার। ঠিকাটি তুমার দেড়া কর্য়ে দিব আজ হত্যে। উই সুমুন্দির বিবেকটি বিনা গান যে হবে নাই। যাও হে মাষ্টার।

অসম্মতি জানানো অসাধ্য হয়ে পড়ে মধুময়ের পক্ষে।

খুঁজে খুঁজে ঘরটার সামনে এসে দাঁড়ায় মধুময়।

অন্ধকার। ঝাঁপ বন্ধ। ভিতরে আলো জ্বলছে। কানে আসে চাপা কণ্ঠস্বর।

সব দ্বিধা-সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলার প্রচেষ্টা সত্বেও বাধো-বাধো কণ্ঠে ডাক দেয় মধুময়ঃ কালী ! কালী আছো ?

কথাবার্তা থেমে যায় ভিতরে। মুহূর্ত কয়েক পরে ঝাঁপটা খুলে যায়। ধূমায়মান কেরোসিনের ডিবেটা থেকে একঝলক পাণ্ডুর আলো এসে পড়ে মধুময়ের ওপর।

ঃ মাষ্টার !

বিস্মিত হয় কালীধাড়া।

পিছন থেকে আগিয়ে এসে এবার কালীর পাশে দাঁড়ায় মেয়েটি। চিনতে পারে সে মধুময়কে।

যেন অসহ যাতনার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময় ভরে সে ককিয়ে উঠেঃ দেবতা ! তুমি কেনে আইছ ইখানে ? কেনে আইছ গো ই নরকে ?

কান্না উপচে পড়তে চায় তার কণ্ঠে।

মধুময় বিব্রত, অপ্রতিভ হয়ে পড়ে তার আচরণে।

কোনওমতে বলেঃ গান আরম্ভ হবার সময় হোল। তাই ওরা আমায় পাঠালো কালীকে ডেকে নিয়ে যেতে।

ঃ গান ! সময় হইছে নাকি ?

কালীধাড়া হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে।

মেয়েটি কালীকে বলেঃ যাও গো, অঙ্গটি তোল ইবার।

ঃ না।—দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করে কালীঃ গান আর গাইব নাই।

ঃ গাইবে নাই ?

ঃ না। তোরে ছেড়্যে আর কুথাও যাবো নাই।

ঃ যাবে নাই ?

ঃ না।

ঃ ই নরকে পচিবে আমার তরে ?

ঃ হাঁ। তুই যেখানে রয়্যেছিস, সিটা আমার তরে নরক নারে সগ্গ।

ঃ সিটা হবে নাই গো।

মেয়েটি এবার ওকে ঠেলে বার করার চেষ্টা করতে করতে বলে ঃ যাও, যাও না কেনে গো !

ঃ তাড়ায়্যে দিছিস্ ?

ঃ হাঁ হাঁ, দিছি ! ঝাঁঝিয়ে ওঠে মেয়েটি। কালীকে ধাক্কা দিতে দিতে অসহায় কণ্ঠে সে মধুময়কে অনুরোধ জানায় ঃ দেবতা গো, তুমার পায়ে ধরি, নিয়্যে যাও তুমি ইটাকে ! নিয়ে যাও !

কৌতুহল চাপতে পারে না মধুময়।

জিজ্ঞাসা করে ঃ সেদিন কিন্তু ঠিক এমনি ভাবেই তুমি ওকে ডেকে দিতে বলেছিলে।

ঃ হঁা। আজ কইছি, বারায়্যে যেতে। অবাক হইছ কেনে গো ? মোরা সব পারি গো দেবতা, সব পারি ! নিয়ে যাও ইটারে ধর্য়্যে।

সজোর একটা ধাক্কায় এবার সে কালীকে বাইরে ঠেলে দিয়ে পরক্ষণেই ভিতর থেকে এক ঝটকায় ঝাঁপটাকে টেনে বন্ধ করে দেয়।

নীরবে হাঁটছিল ওরা। পাশাপাশি। থমথমে অন্ধকার আর অসহ নীরবতা।

সহসা সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলে উঠলো কালী ধাড়া ঃ মাষ্টার ই শালার পেটটি অতি দুষমণ বটে, না হে ?

ঃ হঁা।

প্রসঙ্গটার এহেন আকস্মিক দার্শনিক আবির্ভাবের কারণ খুঁজে পায় না মধুময়।

আবার চুপ করে যায় কালী। নীরবে আবার দুজনে হাঁটতে থাকে। কৌতুহল উদগ্র হয়ে ওঠে মধুময়ের।

তাই স্বাভাবিক অভ্যাস লঙ্ঘণ করে জিজ্ঞাসা করে বসে ঃ কী তুমি ওখানে পাও কালী যে—

বাধা দিয়ে কালী বলে ওঠে ঃ ভালবাসা।

ঃ ভালবাসা ওরা বিক্রি করে কালী।

প্রচণ্ড বিরক্তিতে ফুঁসিয়ে ওঠে কালী ঃ বাজে কথা কয়্যো না মাষ্টার ! ভাল তুমি বাসো নাই কোনও জনারে, জানবে কী কর্যে ?

দিন দিন উপসর্গ বেড়েই চলে কালীর।

বেড়ে চলে তার মৌনী অনুপস্থিতি, আর বোতলের মাত্রা।

প্রতিরাত্রে নিয়মিত সময়ে যাত্রার আসরে শ্যামলা মেয়েটিকেও দেখা যায় নির্দিষ্ট স্থানটিতে। গান গায় কালী। রঙ মাখে। পোষাক চাপায় যেন যন্ত্র একটা।

দলের সবাই নিদারুণ আশ্চর্য হয় কালীর এবারকার ভাবান্তরে। এমন কি খোদ বটুকদাসও।

মধুময়কে একদিন বলেই ফেলে বটুকদাস ঃ ইবার কিন্তু ই মোর ছ্যারাদ্দের পুরুত বিবেকটি বড় তাজ্জব ব্যাপার করিছে বটে। বুঝিলে হে মাষ্টার, ইসব কাণ্ড উই সুমুন্দির কিছু নূতন না। কিন্তু ইমনটি আর দেখি নাই। কত গণ্ডা দেবকন্যা পারা মেয়্যে নিয়ে মাতন কর্যে আবার উই শয়তান দুটি দিন বাদে সেগুলারে ভাঙা সান্‌কির পারা ছুড়্যে ফেলে দিছে। আবার ইবার ইটা কী কাণ্ড হে ? উই কালো কেল্‌টি পুঁচকে মেয়েটি উটারে ইমন ক্ষ্যাপা বানাইছে ?

মধুময় বলে ঃ আমিও কিছু বুঝতে পারছি না।

ঃ পারিবে নাই।—বিজ্ঞের মতন বটুকদাস বলে ওঠে ঃ ইমনটাই হয় হে ! কালনাগিনীরে ফুস্‌-মন্তরে বশ করিছে যে সাপুড়ে বাহাদুর, চিতির বিষে একদিন জরজর হয়্যে শিঙা ফুঁকে সেই খোলোয়াড়ই। কথাটি কি জান মাষ্টার ? যার তরে যার মজে মন, সে কিবা হাড়ি কিবা ডোম।...

পরিস্থিতি চরমে ওঠে গ্রামে যাত্রাগানের শেষ রাতটিতে।

পরদিন সকালেই দল চলে যাবে এ-গ্রাম ছেড়ে ক্রোশ পনেরো দূরে আর এক গ্রামে। এবার হাঁটাপথ নয়। যেতে হবে নৌকাপথে

দামোদরে উজান বেয়ে। গান শেষ হোল রাত তুটো নাগাদ। নৌকো ছাড়বে সকাল আটটায়। স্রোতের শ্যাওলা। স্রোতে ভাসতে ভাসতে ঢুকে পড়েছিল নিস্তরঙ্গ একটা খাঁড়ির মধ্যে। স্থিরতা পেয়েছিল কটা দিনের জন্যে। শেকড় নামেনি। নামাবার অবসর মেলেনি। জোয়ার এলো। টানলো শ্যাওলা-দলকে। ভাসতে হবে আবার। স্রোতের টানে যেতে হবে খাঁড়ি থেকে অন্য খাঁড়িতে।

আহার-পর্বের পরেই ব্যস্ত হয়ে পড়লো সবাই বেডিং বাঁধতে, স্যুটকেশ গুছোতে।

বটুকদাস এসে আড়ালে নিরিবিলিতে ডেকে নিয়ে গেল মধুময়কে। বললো ঃ বাধাইছে আবার মুস্কিল হে।

ঃ কে?

অবুঝের মতন জিজ্ঞাসা করলো মধুময়।

ঃ কে আবার?—পরমতম বিরক্তিভরে গর্জে উঠলো বটুকদাস ঃ মোর বাপের ঠাকুর উই শালা বিবেকটি। কইছে কি জানো? যাবে নাই এক না'য়ে মোদের সাথে।

ঃ তবে?

ঃ কইছে তো পরে যাবে। বিকালে ভিন্ন না'য়ে। গুষ্টির পিণ্ডি কি যেন মহাকর্ম রইছে সুমুন্দির মোর উই হারামজাদী কেল্‌টির সাথে। কী রয়েছে লাটসাহেবের মনটিতে উই জানে। হয়তো "লেগ্" দিবার মতলব।

যাত্রার দলে "লেগ্ দেওয়া" কথাটা খুব ব্যবহার হয়—"ল্যাং মারা", অর্থাৎ ফাঁকী দেওয়া বা ভোগানো অর্থে।

ঃ উপায়?

ঃ উপায় একটিই আছে হে।

সহসা আবার সকরুণ অনুরোধে বলে ওঠে বটুকদাস ঃ তুমিই পারিবে মোরে ই বিপদ হতে বাঁচাতে। উই সুমুন্দির তরে তুমি রইবে ইখানে। সব ব্যবস্থা করো্যে দিব। বিকালে মোর চৌদ্দপুরুষের

বোনাইটিরে পাকড়াও কর্যে নিয়ে যাবে তুমি। তুমি বিনা ই কর্মটি আর কারও সাধ্য না হে মাষ্টার।

মধুময় কী যেন বলতে যাচ্ছিল।

বাধা দিয়ে ওর হাতদুটি আঁকড়ে ধরে ককিয়ে উঠলো বটুকদাস : দোহাই মাষ্টার, তুমিও আর না-টি কর্যো নাই হে! .

না করতে পারেও না মধুময়।

কী কষ্টে যে মধুময় ছাড়িয়ে আনে কালীকে, তা সে-ই জানে।

যত কাঁদে কালী, তত মেয়েটি। কিছুতে ছেড়ে আসবে না কালী। অতবড় মানুষটা, বার বার কেঁদে আকুল হয়।

কাঁদে আর বলে : না না, আমি যাবো নাই মাষ্টার! যেতে আমি পারিব নাই।

মেয়েটিও কাঁদে। হাপুস নয়নে অঝোরধারে কাঁদে।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাতর মিনতি জানায় মধুময়কে : নিয়্যে যাও গো দেবতা, ইটারে তুমি নিয়্যে যাও!

: না, তোরে ছেড়্যে আমি যেতে পারিব নাই রে! মনটি মোর চাইছে নাই।

: কিন্তু তুমারে আমি কেমন কর্যে ই পাঁকের ভিতরে টেন্যে নামাই গো! আমার তরে মানুষে তুমারে মন্দ কইবে, সিটায় যে মোর বুকে বাজ হানিবে গো! তুমি যাও। দেবতা, নিয়্যে যাও না কেনে গো ইটাকে! তুমার দুটি পায়ে ধরি গো, নিয়্যে যাও!

: না, যাবো নাই।

তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ফুঁসে উঠেছিল কালী।

মধুময় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এমনটা সে কখনও দেখেনি। পড়েছে উপন্যাসে-গল্পে। কান্না দেখে ওরও যেন কান্না ঠেলে আসতে চাইছিল। ইচ্ছা হচ্ছিল ছুটে পালাতে।

কোনমতে বলেছিল : গোটা দলটা মারা পড়বে যে কালী।

ডুকরে উঠেছিল কালী : মরুক কেনে। আমি কেনে সি কথাটি ভাবিব হে ? ওদের তরে আমারে ভাবিতে হবে ? মোর তরে কোন্ জন ভাবে হে ? ই তো মোটে একজনা। ইটারেও তুমি ছেড়ো যেতে কও ? না, যাবো নাই। গাইব নাই আর গান।

: হাঁ, যাবে তুমি।

অশ্রুসিক্তকণ্ঠে ধমকে উঠেছিল মেয়েটি : না যাবে তো মোর মরামুখটি দেখিবে। তুমার কিরা, গলায় দড়ি দিব! ঝাঁপ দিব দামুদরে।

একরকম জোর করে টেনে-হিঁচড়ে কালীকে ধরে এনেছিল মধুময়।...

ছ'নম্বর থেকে বার হয়ে সেই যে মুখ বন্ধ করেছিল কালী, নৌকোয় উঠেও সে-মুখ আর খোলেনি। পাথর হয়ে গিয়েছিল।

কথা বলেনি মধুময়ও। ভেবে পায়নি, কী কথা বলবে?

অন্ধকার নেমে এসেছে দামোদরের বুকে। ছইয়ের মধ্যে মুখোমুখি বসেছিল ওরা দুজনে। ভাল করে মুখ দেখা যায় না। কানে যায় শুধু নিঃশ্বাসের শব্দ।

বাইরে একটানা একঘেয়ে জল কেটে দাঁড় টানার শব্দ—ছপ্ ছপ্ ...ছপাছপ্...ছলাৎ...

হাঁপিয়ে ওঠে মধুময়। দম যেন তার বন্ধ হয়ে আসতে চাইছিল।

ডাকলো : কালী।

: উঁ ?

দু'হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে থেকেই সাড়া দিল কালী।

মধুময় জিজ্ঞাসা করলো : কী নাম মেয়েটির ?

: টিয়া।

: বড্ড ভালবেসেছিলে ?

: হাঁ।

: আগেকার চেনা বুঝি ?

: হঁ্যা।

নিস্প্রাণকণ্ঠে জবাব দেয় কালী : একদিন—সিটা বিস্তর দিন হয়্যে গেছে—আকালের কালে—হাতটি ধর‍্যে উটারে ইপথে আমিই নামায়্যে ছিলাম। উটার নিজের তরে, মোর তরেও। কইছি নাই, ই শালার পেটটি বড় তুষমণ? ত্যাখন ঢুকি নাই তো ই পোড়া গানের দলে। পেটের তরে ট্যাকা, আর সিই ট্যাকার তরেই ইমন অন্যায়টি করেছিলাম বটে।

গাঁয়ের মেয়ে বুঝি?

: হঁ্যা।

কথাটা বলেই চুপ করে যায় কালীধাড়া ক্ষণেকের জন্যে। যেন অন্যমনস্ক হয়ে ফিরে যায় সে পিছনের সেই দিনগুলোয়।

তারপর আবার নিস্প্রাণ শুষ্ককণ্ঠে বলে ওঠে : টিয়া মোর নিজের মেয়্যেটি হে মাষ্টার।

চমকে উঠলো মধুময়।

মনে হোল, প্রচণ্ড একটা ধাক্কা লেগে নৌকোটা তুলে উঠলো থরথরিয়ে।

গেল বুঝি ডুবেই বা।···

কালীধাড়া আর টিয়া।—পরস্পরের জন্যে ওদের ভালোবাসার অন্ত ছিল না। মধুময় তার কিছুটা স্বচক্ষে দেখেছে। ভাল চেয়েছিল ওরা তু'জনাই তু'জনার। অথচ ভাল হয়নি তার একজনেরও। ওদের ভালবাসাই শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিচ্ছেদের একমাত্র হেতু, আর মিলনের প্রধানতম অন্তরায়।

কালীধাড়া লেখাপড়া শেখেনি, দার্শনিক নয়। তাই এহেন বিপর্যয়ের আর কোনও কারণ সে খুঁজে পায়নি। দোষ দেয়নি কালীধাড়া আধুনিক সমাজ আর শ্রেণীবিন্যাসকে। খুঁত ধরেনি অর্থনৈতিক কাঠামোর।

শুধু বলেছিল ঃ ই প্যাট্টি হইছে দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় দুষমণ !···

কিন্তু ব্রজরানীর কথাটা মনে পড়লেই মধুময়কে আবার নতুন করে ভাবতে হয়।

ব্রজরাণীর বেলায় তো পোড়াপেট বাদ সাধেনি। তবে কেন তাকে নিয়ে জড়িয়ে ঘটলো অমন একটা অবিশ্বাস্য দুর্যোগ ? তার ভালবাসা কেন পেল না সার্থকতা ? আর যাই হোক, অতবড় ট্র্যাজেডিটার জন্যে ব্রজরাণীর নিজের তো ছিল না কোন ত্রুটি আর বিচ্যুতি।

তবে !

ব্রজরাণী সাজা পেল কোন অপরাধে ?

কোথায় ঘটেছিল অমন ব্যাপারটা ? ···কোথায় ? ···কোন্ গাঁয়ে ?······

ফুলমারিতে।···হাঁ ঠিক, ফুলমারির জমিদার-বাড়িতেই তো।···

যেন ক্ষেপে উঠেছিল অনন্ত মজুমদার।···

অবিশ্যি দোষ দেওয়া যায় না ফুলমারির নায়েব অনন্ত মজুমদারকে।

কতবার কতো জায়গায় মোটা মোটা টাকার বাজি হয়ে গেছে ব্রজরানীর স্বরূপ নিয়ে। বহু জায়গায় মধুময়কেই মধ্যস্থতা করতে হয়েছে।

মানায় ব্রজরানীকে নিখুঁত। এতটুকু সন্দেহের অবকাশ থাকে না। চলন, বাচন, ভঙ্গী,—কিচ্ছুতে না।

পঁয়ষট্টি বছরের নিষ্ঠাবান তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ অনন্ত মজুমদারের দোষ কী ?

বায়না ধরেছিলেন বৃদ্ধ, একবার তিনি নিভৃতে ব্রজরানীকে দেখবেন, দুটো কথা কইবেন।···

"দি নিউ রয়েল অন্নপূর্ণা অপেরা পার্টি" গিয়েছিল ফুলমারির জমিদার বাড়িতে পুণ্যাহ উপলক্ষে। ফি বছর হয় গ্রামের দলের অভিনয়। সেবার আয় ছিল নাকি আশাতীত ভাল। কটা পুরাণো

মকদ্দমায় জয় হয়েছিল জমিদার-তরফের। তাই দল গিয়েছিল কোলকাতা থেকে।

হৈ-হৈ পড়ে গিয়েছিল। এমন কাণ্ড আগে ওরা আর কোনদিন চক্ষে দেখেনি। এবার অবিশ্যি দেখছে ক'দিন ধরে। বিশ্বাস কিন্তু কেউ করবে না।

হৈ-হৈ-এর কারণ ব্রজরানী।

কেউ বিশ্বাস করবে না যে সে পুরুষমানুষ। পুরুষমানুষকে মেয়ে সাজালে যে অমন নিখুঁত দেখাতে পারে, অমন সাবলীল হতে পারে তার রূপায়ণ, কাউকে তা বিশ্বাস করানো যায় না। সবারই ধারণা —আসলে ব্রজরানী এক অভিনেত্রী।

অবিশ্যি এমন ধারণার ওদের কারণও ছিল।

যুগের সঙ্গে তাল রাখতে ইদানিং পেশাদার যাত্রাদলের কটাতে অভিনেত্রী আমদানী সুরু হয়ে গেছে। বড় বড় ভূমিকাগুলোয় তারা এখনও অবশ্য মানিয়ে নিতে পারে না। খোলা আসরে মাঠ জমাতে হলে যে দরাজ গলা, আর সাহস দরকার, অভাবটা প্রধানতঃ তারই। তাই বাঈজী, নর্তকী, সখী, উদাসিনী, নিয়তি আর ভৈরবী নিয়েই তারা নাজেহাল।

তারা পার্ট না পারুক, তাদের কল্যাণে দলের আয় কিন্তু মন্দ হয় না। ভীড় ভেঙে পড়ে। আসরের চাইতে সে-ভীড় আবার সাজঘরের আশপাশে আরও বেশি। বায়নার দর ওঠে চড়্‌চড়িয়ে।

চীৎপুরের যাত্রাদল। ওরাও চিৎপুরের। ব্যবসা মন্দা। অনেকে তাই পা বাড়ায় এদিকে। আয় মন্দ হয় না। দলের মাইনে তো আছেই। তা ছাড়া উপরি। দলের লোক হাতের পাঁচ। গ্রামে গ্রামেও মোটা অনুগ্রাহক অনেক জোটে। জমিদার, খনি-মালিক, গুণ্ডাসর্দার—আরও অনেকে। মাঝে মাঝে এর ফলে দু'একটি কিন্নরী হয়ত দল ছেড়ে ডুবও মারে।

হ্যাণ্ড্‌বিল আর পোষ্টারের কৃপায় এহেন "পক্ষী" হয় "পাঞ্চালী

সেন", "খেঁদি" প্রমোশন পায় "ক্ষমা রায়"-এ, আর "আঙুর" হয়ে ওঠে "অভিজাত অভিনেত্রী আনন্দা চৌধুরী।"

"ব্রজরানী" নামটাই সবচেয়ে গোল বাধায়। পুরুষই যদি হবে, তাহলে মেয়েলী নাম কেন হে?

কৈফিয়ৎ দিয়ে দিয়ে আর পারে না বটুকদাস। এককথা কাঁহাতক কতজনকে বলবে? রাগ হওয়া তাই স্বাভাবিক।

রেগে খিঁচিয়ে বলে: আরে, ই শালা মোর বাপের ঠাউর ব্রজরানীটিতো মোরে নাহক ফ্যাসাদে ফেলিছে হে!

মধুময়কে কাছে ডেকে সাক্ষী মানে বটুকদাস: দেখিছ হে, দেখিছ মাষ্টার, ই ঢেকিকলের গানের দলটিতে মোর কেমন সুখটি মিলিছে বটে? দিব—রও কেনে, যাক আর দুটো দিন, দিব ই চুলোর দলটি উঠায়ো। চুকে যাবে ল্যাঠাটি—হাঁ!

…পরক্ষণেই বটুকদাস অপেক্ষমান কৌতূহলী জনতাকে উদ্দেশ করে খিঁচিয়ে ওঠে: আর হাঁ, তুমরা মোর বাপ-পিতেমোর ধম্মো-পুত্তুরেরা ইবার মোর পাছাটি ছাড়িবে কিনা কও দিকি হে? আরে কইছিনা যে আমার দলটিতে উসব মাগীর ঝামেলা নাই রে বাপু, নাই।

শুনবে কেন ওরা সে-কথা?

বলে: নামটি তালে "ব্রজরানী" হইছে কেনে হে অধিকারী?

ওদের অজ্ঞতা আর নির্বুদ্ধিতায় অবাক হয় বটুকদাস।

বলে: লাও হে, শোনো ইয়ারের কথাটি! আরে, ইমনটাই যে গানের দলের রেওয়াজটি বটে।

বটুকদাস ওদের বুঝিয়ে বলে যাত্রাদলের যত বিচিত্র রেওয়াজ-রহস্য। অবাক হয়ে শোনে ওরা।

গোঁফ-কামানো মদ্দ পুরুষেই মেয়ে সাজে। কেউ রাণী, কেউ যুবরানী, কেউ দেবী, কেউ রাক্ষসী, কেউ বা নর্তকী। নিত্য রাতে একই ধরণের অভিনয় করে করে আর অষ্টপ্রহর মেয়েলীপণা নকল করার প্রচেষ্টায় ক্রমশঃ তারা একসময়ে অভিনয়ের বাইরেও মেয়েলী

হয়ে পড়ে। অভ্যাসটুকু স্বভাব হয়ে দাঁড়ায়। চলে কোমর দুলিয়ে, পাশে চলতে গায়ে ঢলে ঢলে পড়ে, হাসে ঘাড় ঘুরিয়ে বিলোল কটাক্ষ হেনে, কথা বলে মিহিসুরে ইনিয়ে-বিনিয়ে অবিকল মেয়েলী বুকনিতে। যত যে নিখুঁত, তত তার নাম আর দামও। স্বভাবের মতন নাম-গুলোও তারা ক্রমশঃ পাল্‌টে ফেলে। ললিত পাড়ুই হয় "ললিতা-সখী", প্রতুল ধাড়া হয় "পুতুলরানী", বৃন্দাবন নস্কর হয় "বিন্দে-দূতী",—যার যেমন পার্ট।

মধুময়ের অজানা নয় কথাগুলো। প্রথম প্রথম এই সরল গ্রামীনদের চেয়ে অবাক ও নিজেও কম হোত না। মনে হোত—ও যেন স্বপ্নঘোরে গিয়ে পড়েছে কোন্ রূপকথার রাজ্যে—যেখানে সোণারকাঠি-রূপোরকাঠির মোহনমায়ার ক্ষণে ক্ষণে নারী পুরুষের ঘটে অবিশ্বাস্য যত রহস্যময় রূপান্তর। দিনের পর দিন আর রাতের পর রাত নাট্যকার মধুময় অবাক চোখ মেলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেছে ওদের। একটু একটু করে খ'সে খ'সে পড়েছে যত রহস্যাবরণ।

আজ আর মধুময় এতে অবাক হবার কিছু খুঁজে পায় না। বরং অবাক কাউকে হ'তে দেখলে ও মনে মনে বেশ খানিকটা কৌতুক বোধ করে। হয়তো বা একটু অনুকম্পাও জাগে সেইসব অজ্ঞ জনেদের ওপর।

একটানা ব্যাখ্যান্তে বটুকদাস উপসংহার টানে: বুঝিছ হে মোর গুষ্টির কুটুমেরা, ইমনটিই ই যত পোড়া দলের রেওয়াজটি বটে। ই ব্যাটা মোর বোনাইয়ের নাতজামাই ব্রজগোপাল শামুই তাই নামটি ভাঁড়ায়্যে মোর মাথাটি চিবাতে "ব্রজরানী" হইছেন বটে।

বলতে পারতো বটুকদাস দলের আরো অনেক গুহ্যকথা, অনেক তামস-রহস্য। মুখে অবিশ্যি বটুকদাসের আটকায় না কিছু। তবু বলে না। চেপে যায়। দলের তাতে বদনাম। বলাও যায় না সেসব নোংরা কথা বাইরের লোকের কাছে।

সন্দেহ তবু ওদের নিরসন হয় না। পুরুষ পুরুষই। পুরুষের

মেয়েলীপণা অমন নিখুঁত হয় নাকি কখনও? পুরুষ তো ছাড়, অমন একটা মেয়েও নাকি সচরাচর নজরে পড়ে না। যাত্রাদল তো যেমন-তেমন। সহরে ওরা প্রায়ই যায় বছরে দু'একবার নানান বরাতে। থিয়েটার-বায়োস্কোপেও অমন মেয়ের দেখা ওরা নাকি পায়নি কোনদিন।

এবার আর রাগে না বটুকদাস। খুশি হয় নিজের দলের শিল্পী সমৃদ্ধিতে।

স্মিত হেসে বলে: হাঁ, ইটি কইছ বটে হক কথাটি। ই শালার জুড়িটি নাই। আর সিই দেমাকেই তো নবানন্দনের রাক্ষুসে খাঁইটিও হইছে বটে। মুঠিমুঠি ট্যাকা দিয়ে তবে গস্ত করেয়েছি হে ই মন্দা মেয়েটিরে। ত্রিভুবনে গানের দলে ইমনটি আর পাবে নাই হে—হ্যাঁ!

: ঝাড়ু মার মোর ঘরের বৌটির মাথায়! ইমন রত্নটি পেল্যে মাথায় কর‍্যে রাখি হে! উচ্ছ্বাসাধিক্যে গদ্‌গদ হয়ে কে যেন লুব্ধকণ্ঠে বলে ফেলে।

একা সেই-ই নয়। বহুকণ্ঠ একসঙ্গে চুক্‌চুক করে ওঠে। পঙ্কিল একটা প্রচ্ছন্ন কামনার গুঞ্জন।

: আহা, বলিছ বটে হে মনের কথাটি।

: ই যদি মন্দ বটে, তালে সব ছেড়েছুড়ে ইটারে লিয়্যেই ভাসি না কেনে ভবসাগরে!

মধুময় শুন্‌ছিল আর শিটিয়ে উঠ্‌ছিল। হোলও তাই।

ঝাঁ করে আবার রক্ত চড়ে যায় বটুকদাসের মাথায়। রাগের মাথায় যা বলা উচিত নয়, তাও এবার বেঁফাস করে ফেলে।

খিঁচিয়ে ওঠে নতুন উৎসাহে: তা যাও না কেনে হে, মণ্ডড়াটি লও না কেনে একটিবার! ফতুর হয়্যে যাবে হে! খাঁটির চেয়্যে ই পোড়া মেকীর জেল্লাটি বেশি, সিকথাটি ভুলিছ কেনে? যাও, সখটি মিটায়্যে আস!

: পেন্নামিটি কত্যো, সিটা আগে জানান দাও দিকি হে অধিকারী।—কে যেন ফোড়ন কাটে।

খ্যাঁকখ্যাঁক করে ক্লেদাক্ত জান্তব হেসে ওঠে আর সবাই।

বটুকদাসের এবার আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না।

পাগলের মতন হাত-পা ছুঁড়ে চিৎকার করে চলেঃ প্রেণামী? শুনিবে? অ্যাঁ, কী বলিছ হে ধর্মোবাপ, শুনিবে? তবে শুন হে,—দুটি কাণ পেত্যে ভক্তিভরে শুন তবে ই-মহাভারতের অমৃতসমান কথাটি! উই মোর ছ্যারাদের পুরুত ব্রজরানী পর্যন্ত আর যেতে হবে নাই হে! উয়ার নিচের ধাপগুলার বায়নাকাটি শুন আগে।

: আহা, "শুন-শুন" তো করিছ অধিকারী সিই কুন্ আদ্দিকাল হত্যে। শুনাও না কেনে।

: শুনিবে বাপ? শুনিলে সর্বাঙ্গ হিম হয়্যে যাবে নাই তো মোর সখের নাগর? উই যে মোর যুবরানী পুতুল, উই হারামজাদার তরে আত্মহত্যা হইছে তিনজন। আহাম্মুক!

: কও কী হে অধিকারী?—ভেসে আসে একটা বিস্মিত প্রশ্ন।

অধিকারী বটুকদাস নেচে ওঠে একটা বন্য আনন্দে।

বলে চলেঃ কইছি হে খাঁটি কথাটি। আরও শুন না কেনে। উই যে মোর আবাগের পুত "ললিতা-সখী", উই গুণনিধি কী করিছে জান? তুমাদের পারা যত হাঘরে মক্কেল পাক্ড়ায়্যে দু'খানি বাড়ি বানাইছে, ভাড়া দিছে, বাড়িউলী হইছে! আর "নলিনী নিয়তি"-টি খাঁটি সোনার অলঙ্কার বানাইছে তিন স্যুট্।

শুনে ওরা সত্যিই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়।

তা দেখে খুশি উপচে পড়ে বটুকদাসের। জিঘাংসুর নির্মম তৃপ্তিতে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বাক্যবান ছাড়েঃ অমন হাঁ করে্য আমার প্যাঁচামুখটিতে কী দেখিছ বাপ? হাঁ হে, হাঁ, ইসবই উয়ারা করিছে বটে উয়াদের ওই পচা পাঁকের কারবারে। যাও না কেনে, সাধ হইছে, চন্দনলেপা করে্য সর্বাঙ্গে মেখে আস না কেনে সিই

আঁস্তাকুড়ের পাঁক খাব্‌লা খাব্‌লা কর‍্যে।

ঃ আর তুমার ব্রজরাণীটি ?

বটুকদাস পাশব চিৎকারে জবাব দেয়ঃ উহার পাছে আর ফেউটি লাগিতে হবে নাই হে! উ শালা হইছে সৃষ্টিছাড়া। উসব আঁস্তাকুড়ের কারবার উয়ার বাপের জন্মে নাই। দেখিছ বটে অমন মোলায়েম চিজখানি। আসলে মহাগুণ্ডা বটে একটি। ইমন প্রস্তাবটি উয়ার কাছে করিছ কি দিবে তুমার তলপ্যাটটিতে চৌচাপটে দুটি লাথি বসায়্যে, রক্ত উদ্‌গার করে শিঙাটি ফুঁকিবে হে—হঁা! ই আঁটকুড়ির নন্দন মোর তেমন চিজ্‌টি না।...

চিৎকার করতে করতে জ্ঞান যায় বটুকদাসের, মুখে তার ফেকো ওড়ে বাছা বাছা খিস্তির।

তবু রেহাই নেই। একদল পালায় তো অন্যদল পাকড়াও করে। তারপর আবার! আবার!...

মিথ্যেকথা বলেনি বটুকদাস। মধুময় জানে।

যাত্রাদলে চল্‌তি কথা ফেরে—"মশারির মাঝে বাদশার হারেম।"

অর্থাৎ—সেকালে বাদ্‌শার হারেমের মতন ওদের মশারির মধ্যেও কোনও অপকর্মই অপকর্ম নয়।

ব্রজরানী কিন্তু সত্যিই দলছাড়া।

তার প্রকৃত রূপ আর স্বরূপ দেখলে সত্যিই বিশ্বাস করা যায়না যে সাজলে তাকে অমন অপরূপা দেখায়। সাজঘরে পাশে বসে কত রাতে মধুময় অনিমেষে চেয়ে চেয়ে দেখেছে ব্রজরানীর রূপান্তর। সাজতেও জানে বটে। পুরো একটি ঘণ্টা লাগে তার শুধু রঙকামে আর পরচুল ফিট্ করতে। তিল তিল করে রূপান্তর সমাধা করেছে ব্রজরানী, বিস্মিত মধুময় আরো—আরো অবাক হয়েছে।

চওড়া খুব না হোক, ব্রজরানী অনেকের চেয়ে মাথায় লম্বা।

সুপুষ্ট দেহ। চোখ নাক টিকলো হলে কী হয়? ব্রজরাণীর সর্বাঙ্গে বনমানুষের মত লোম। নিউভিট মেখে অনাবৃত দেহাংশ নির্লোম রাখে। দাড়ি-গোঁফ ক্ষুরে কামায় না কোন দিন। নারী-চরিত্রাভিনেতারা কেউই তা করে না। তাহলে যে গোঁফদাড়ি কড়া হয়ে যাবে, মুখে পড়বে কালচে আভা। ছোট সন্না দিয়ে একটি একটি করে ওরা স্বহস্তে উপড়ে ফেলে প্রতিটি দাড়িগোঁফ। মুখ-চোখের অভিব্যক্তিতে বেশ বোঝা যায়—এ-প্রক্রিয়াটির যন্ত্রণা কম নয়। মাঝে মাঝে ফিনকি দিয়ে রক্ত বার হয়। সব সহ্য করে ওরা মুখ বুজে। জঞ্জালকে সমূলে উচ্ছেদ করার সাধনা ওদের।

ব্রজরাণী কালো। বেশ কালো। অমন ছুটো চোখ, রাতের অভিনয়ে আসরে যার কটাক্ষে আত্মহার হয় কত শত দর্শক, অন্যসময়ে সারাক্ষণ তা হয়ে থাকে লাল টকটকে। মদ খায় দিনরাত। আকণ্ঠ। চোলাই মদ। জুয়াও খেলে। অদ্ভুত বরাত ওর জুয়ায়। বাজি হারবে নির্ঘাৎ। কথা বলে হুহুঙ্কারে মুখ খারাপ করে। চলে লড়াইয়ের ঘোড়ার মতন জোর কদমে। হাসে অট্টরবে। মারামারি বা গুণ্ডামির গন্ধ পেলে হয়, পা বাড়ায় সবার আগে। শুধু পুরুষ নয়, বাস্তবজীবনে ব্রজরাণী এক আকাট মরদ।

ব্রজরাণী সত্যিই এক বিস্ময়। শুধু এ-দলই নয়, যাত্রাদলের ইতিহাসে এমনটি আর দেখা যায়নি।

পুতুলরাণী আপশোষ করে বলেঃ—মাইরি, আমি শালা তুর মতন হল্যে ইতদিনে ইমন ছুটি দলের মালকাইন্ হতাম রে!

আটপৌরে কথাতেও ওরা নিজেদের সম্পর্কে মেয়েলী অলঙ্কার ব্যবহার করে। তাই "মালিকের" বদলে "মালকাইন্" কথাটা জুড়ে দেয়।

মুখ থেকে মদের গেলাসটা নামিয়ে নিয়ে ব্রজ একটা খিস্তি-সহ-যোগে জবাব দেয়ঃ আপশোষ করিস নাই মৌটুসি। তুর এ্যাখুনও অঢেল বেলা পড়ে রইছে। আশীর্বাদ করি, ছুটি নারে, চারটি ইমন

দল হবে তুর।

নিয়তি নলিনী বলে ঃ ইত নামটি তুর? কী করিছ তা নিয়্যে? ইমন সোনার অঙ্গ আর ভরা ভাদরের যৈবন—

হেসে টিপ্পনি কাটে নন্দ ঃ ভিতরে ভিতরে চড়া পড়িছে রে! তাই গাঙ্‌ পারাতে না ঠেক খাইছে! তা তুরও কম বাড়বাড়ন্ত হবে নাই রে সোহাগী! কুন হাবাতে রাজপুত্তুর কুন দিন তুর নিয়তিতে বাঁধা পড়িবে—ব্যস, মনস্কামনা পুরিবে তুর সাথে সাথে!

হাসির তুফান ওঠে।

পাশের ঘরে শিটিয়ে বসে থাকে মধুময়। না পারে ওদের এই রসিকতা সহ্য করতে না পারে ঘর ছেড়ে পালাতে। তাহলেই ওদের নজরে পড়ে যাবে। হয়তো ওরা লজ্জা পাবে। তারচেয়েও কিন্তু বেশি লজ্জা পাবে ও নিজে।

ললিতা-সখী হেসে পুতুলরানীর গায়ে গড়িয়ে পড়ে ককিয়ে ওঠে ঃ তুর দিব্যি নন্দ! ইতকালের রেওয়াজটি তু ইমন কর্যে ভাঙিস নাই রে! বলনা কেনে, কারে তুর মনে ধরিছে, এনে দিহি তারেই।

ঃ দিবি?

ঃ মাইরি দিব। মুখ ফুটে শুধু তার নামটি একটিবার শুনা না কেনে। কে তুর মনচোর লো?

ঃ যমরাজা!

ক্ষণেকের জন্যে ওরা বোধহয় স্তব্ধ হয়ে যায়।

তারপরেই শোনা যায় ললিতা-সখীর কলকণ্ঠ ঃ তু মর—মর ব্রজরাণী! তু হইছিস একটি কলঙ্কী।...

সারাটা দিনের মধ্যে একটিবারও ঘর থেকে বার করা যায়নি ব্রজরাণীকে।

কৌতুক আর কৌতূহলের উপলক্ষ্য হয়ে ভীড়ের সামনে দাঁড়াতে ওর চিরদিনই অনিচ্ছা। ভিড়ের তাগাদায় অতিষ্ঠ হয়ে মধুময়কে সঙ্গে

নিয়ে বটুকদাস একবার হানা দেয় তার ঘরে। মধুময়কে সঙ্গে নেবার হেতু—যদি ওর খাতিরে নরম হয় ব্রজরাণী।

মুখটাকে নেহাৎ কাঁচুমাচু করে অনুরোধ জানায় বটুকদাস : চল না কেনে ব্রজ একটিবার উই আদেখলেগুনার সুমুখে। প্রাণটি মোর বাঁচাও হে !

বটুকদাসের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে এতটুকু আগ্রহ বা সদিচ্ছা দেখা যায় না ব্রজরাণীর মধ্যে।

খিঁচিয়ে ওঠে : কেনে হে, কেনে ? আমারে কি চিড়িয়াখানার জানোয়ার পেয়েছ নাকি যে সাত গাঁয়ের সব্বাই মিল্যে দেখিবে ? যাবো নাই, যাঃ !

: আহা, কত আশা কর‍্যে আসিছে উয়ারা— একবারটি দেখিবে !

: তা যাও না কেনে তুমার উই আহ্লাদি-পেল্লাদিগুলারে নিয়ে। দেখায়্যে আন। উয়ারাও খুসি হবে, ইরাও দুটা সিকি-দুয়ানি রোজগার করে নিবে ই-ফাঁকে।

নাছোড়বান্দা বটুকদাস করুণতম মিনতি জানায় : চাইছে যে তুমারেই দেখিতে হে ! চল হে—

নিদারুণ বিরক্তিভরে এবার গর্জে ওঠে ব্রজরাণী : দেখিবে ? বেশ, চল হে ! দেখায়্যে দিছি উদের বাপের বিয়াটি, আর তুমারও ! চল'—

রণে ভঙ্গ দেয় বটুকদাস। কিছু বিশ্বাস নেই। সব পারে ও-আকাট।...

সারাটাদিন সবাইকে ঠেকিয়ে রাখলেও সে রাতে নায়েব অনন্ত মজুমদারকে বিমুখ করা অসাধ্য হয়ে পড়ে বটুকদাসের পক্ষে।

পালা হচ্ছিল— দুর্গমাসুর বধ।

যাত্রার পালা। মাথামুণ্ডু বা সঠিক ইতিহাস-পুরাণের বিশেষ দরকার হয়না। থাকা চাই স্থূল যত রস। যুদ্ধ, নাচ, আদিরস, ভাঁড়ামি, দুঃখ, বিবেক আর ভক্তিরস। এ-পালাতেও তার কমতি নেই।

পৌরাণিক কাহিনী।

রক্তবীজ-বংশধর দুর্গমাসুরের অত্যাচারে ত্রিভুবন কম্পমান। দেবতারা স্বর্গচ্যুত! ব্রাহ্মণদল লাঞ্ছিত। নিপীড়িত নারীকুল। সৃষ্টি বুঝি যায় রসাতলে।…সৃষ্টি-রক্ষার্থে তাই মহামায়াকে ধারণ করতে হয় অষ্টাদশভুজা-মূর্তি। অষ্টাদশকরে তার গর্জে উঠলো অষ্টাদশ ভীম প্রহরণ! তুমুল যুদ্ধ হোল। দেবীকরে নিহত হোল দুর্গমাসুর।…

পালা শুনে হৈ-হৈ পড়ে গেল। আহা গো, কী গানই করিছে! যেমন গান, তেমনি যুদ্ধ। যেমন অসুর, তেমনই দেবী। বলিহারি যাই হে!…

সবচেয়ে বেশি সুখ্যাতি ব্রজরাণীর। সে হয়েছিল মহামায়া। কদিন ধরেই সে মাতিয়ে রেখেছে। আজকের কিন্তু তুলনা নেই। সত্যিই যেন সশরীরে দেবী নেমে এসেছেন মাটির পৃথিবীতে। অপরূপ মানিয়েছিল তাকে।

যতবারই আসরে ঢোকে মহামায়া, চারদিক থেকে অসংখ্য কণ্ঠে রব উঠতে থাকে: মা! মা! মাগো…

বিশেষতঃ শেষ দৃশ্যে—দেবী যখন অষ্টাদশভুজা-মূর্তি ধারণ করে যুদ্ধে নিহত করলেন দুর্গমাসুরকে, তখনকার তো কথাই নেই। দুর্গমাসুরের বুকে ত্রিশূল বিঁধিয়ে একপা তার বুকের ওপর তুলে এমনভাবে দাঁড়ালেন দেবী,—ঠিক যেন পাঁজির পাতার মহিষাসুরমর্দিনীর ছবিটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

মা-ডাকে থরথর কেঁপে উঠলো সাতমহলা জমিদার বাড়ি। সার সার মাথা নুয়ে পড়লো মাটির ওপর ভক্তিপূর্ণ প্রণামে।…

নিষ্ঠাবান তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ নায়েব অনন্ত মজুমদার। দুচোখে ঝরছে তার অবিরল অশ্রু।

ধরে বসলেন তিনি অধিকারী বটুকদাসকে। একটিবার দেখা করিয়ে দিতেই হবে। ঐরূপেই তিনি দেখতে চান ব্রজরাণীকে।

কথা নয়, আলাপ নয়, শুধু কাছ থেকে ক্ষণেকের জন্য দেখবেন আর শ্রদ্ধা জানিয়ে আসবেন।

কিছুতেই নিরস্ত করা গেল না তাঁকে।...

সাজঘরে ঢুকলো বটুকদাস নায়েব অনন্ত মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে।

সেখানে তখন ভাঙা মেলা। পালা সাঙ্গ হয়েছে। সবাই ব্যস্ত সাজ খুলতে, রঙ তুলতে। চেনাই যায় না কাউকে। কারো সাজ খোলা হয়ে গেছে, রঙ তুলছে খালি গায়ে শুধু একটা আণ্ডার-প্যান্ট পরে। কারও বা আধখানা দেহের রঙ তোলা হয়ে গেছে, মুখটা তখনও বাকি ;—হাতপা-গুলো কালো কুচকুচে, মুখে অনিন্দ্য কান্তি।

যেন একটা বহুরূপীর রাজ্য। হাসছে। বিড়ি টানছে। মুখ খারাপ করছে কথায় কথায়।

বিস্ময়কর দৃশ্য।

ব্যথাকরও বটে। রূপকথার বাসিন্দাগুলো—রাজা, অসুর, দেবদেবী, উর্বসী, নিয়তি, বিবেক, বিদুষক—সবাই যেন হঠাৎ মাটির মানুষ হয়ে পড়েছে। অতি সাধারণ মানুষ। আটপৌরে মানুষ। অবিশ্বাস্য। তবুও সত্যি। ত্রিভুবনজয়ী দুর্গমাসুর দৌবারিকের মুখ থেকে আধপোড়া বিড়িটা ছিনিয়ে নিয়ে পরম পরিতৃপ্তিতে টানছে। অমৃত বরাভয়কণ্ঠ শঙ্করের কণ্ঠে অনর্গল উচ্চারিত হচ্ছে অশ্রাব্য খিস্তি। উর্বসীর উন্মুক্ত পীনোন্নত রবার-বক্ষ ধরে টানাটানি আর হাসাহাসি করছে দেবর্ষি নারদ। মহারাণীকে পঙ্কিল কটাক্ষে কাবু করে এনেছে অসুরদূত। ইন্দ্রানী শচী চোখ ঠেরে বিদুষক গোপলার গায়ে ঢলে ঢলে পড়ছে। দেব-সেনাপতি কার্তিকেয় পোষাকের একটা সেফটিপিন কোথায় হারিয়ে ফেলেছে বলে বেশকারী ভোঁদড়া তাকে বাপান্ত করছে।

অনন্ত মজুমদারকে বটুকদাস এনে দাঁড় করায় ব্রজরাণীর কাছে।

বলে: ই দিন কেনে আপনার ব্রজরাণী আর দেবী মহামায়াটি।

থ' হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন অনন্ত মজুমদার। হঠাৎ যেন জমে পাথর হয়ে গেছেন বৃদ্ধ। নিষ্প্রাণ। নিথর। পলক পড়ে না বিস্ফারিত দুটি চোখে।

সাজপোষাক তখনও খোলা হয়নি ব্রজরাণীর। বসে আছে নিজের সিটে—মানে, বড় একটা পোষাকের বাক্সের ওপর। সামনে খোলা রয়েছে তার মেক্-আপ বাক্স। রক্তরাঙা বেনারসীখানা হাঁটুর ওপর পর্যন্ত গুটোনো। অনাবৃত পদাংশ মসীকালো, ঘন লোমশ। মাথার পরচুলটাও খোলা। যেন কোন অপরূপার কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশদাম কেটে ছোট করে ফেলা হয়েছে টাইফয়েডের প্রকোপে। একহাতে তার জ্বলন্ত একটা সিগ্রেট। টানছে মাঝে মাঝে। ধূমায়িত অগ্নিগিরির মত গল্‌গল্‌ করে ধোঁয়া বার হচ্ছে নাক-মুখ দিয়ে। অন্য হাতে বে-ছিপি একটা চোলাই মদের বোতল। থেকে থেকে চুমুক মারছে চোঁ-চোঁ করে। দুর্গন্ধে কাছে দাঁড়ানো যায় না।

নায়েব অনন্ত মজুমদারের পাথর-মুখে ফুটে ওঠে কটি কুঞ্চন-রেখা। বিতৃষ্ণা। অপলক চোখে তাঁর উপচে ওঠে পুঞ্জীভূত গ্লানি, অভক্তি, ঘৃণা আর ধিক্কার।

একটা মুহূর্ত মাত্র।

তারপরেই হঠাৎ ঠাস করে ব্রজরাণীর গালে একটা সজোর চড় বসিয়ে দিয়ে ঝড়ের মতন ছুটে বার হয়ে যান অনন্ত মজুমদার।

আশ্চর্য! কিছু বলে না ব্রজরাণী। এতটুকু চটে না। অবাকও হয় না। নীরবে হজম করে গুণ্ডা ব্রজ সেই আঘাত আর অপমান। ব্রজরাণীর জীবনে সেই হয়তো প্রথম।··

যাত্রা শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

রান্নাঘরের পাট চুকে গেছে। ঘুমিয়ে পড়েছে সব্বাই। নিস্তব্ধ

চারদিক। থমথমে।

সাজঘরে তখনও একটা মিটমিটে আলো জ্বলছে। একা বসে আছে তখনও ব্রজরানী। একই আসনে। একইভাবে। মদ টান্‌ছে।

ধীরে ধীরে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ায় বটুকদাস আর মধুময়।

মোলায়েম মৃদুকণ্ঠে বটুকদাস ডাকে ঃ ব্রজ!

ঃ উঁ?

মুখ না তুলেই বোতলে চুমুক দিতে দিতে ব্রজরাণী সাড়া দেয়।

ঃ উঠো ইবার!

ঃ কী দরকার?

ঃ খাবে নাই?

ঃ ইটা তবে করছি কী বটে?

ঃ ইত কেনে খাও হে ই বিষগুলা?

চোখ তোলে ব্রজরাণী। ব্যথাতুর টলটলে দুটি ডাগর চোখ। সে-চোখে আর নেই সেই হিংস্রতা। নরম হয়ে এসেছে। বিষণ্ণ। অবুঝ।

পাল্টা জেরা করে ব্রজরাণী: তুমি জান নাই?

আর কথা বলতে পারে না বটুকদাস। জানে সে।

জানে মধুময়ও। বটুকদাসই একদিন জানিয়েছিল চুপিচুপি।

অনেক আশা আর রঙীন স্বপ্ন নিয়ে ব্রজ একদিন ঘর বেঁধেছিল। পাঁক থেকে এক পঙ্কজিনীকে তুলে এনে ঠাঁই দিয়েছিল। পঙ্কজিনী জানিয়েছিল ওকে তার ভালবাসা। ওর কাছে সে আকুল-ভিক্ষায় চেয়েছিল শুদ্ধ হবার, কল্যাণী হবার একটু সুযোগ।

সে-সুযোগ তাকে দিয়েছিল ব্রজ। ভাল ও নিজেও বেসেছিল যে তাকে।

পঙ্কজিনী দ্বিধাভরে নাকি জানতে চেয়েছিল ঃ হাঁগো, এতে কোনও দোষ হবে না তে?

ঃ কেনে?

সবিস্ময়ে ব্রজও জানতে চেয়েছিল।

ঃ তোমার পাথর গায়ে যে পাঁকের ছোপ লেগেছে গো!

অকুণ্ঠ সান্ত্বনা দিয়েছিল ব্রজরাণীঃ ধুয়ে্য গেছে তা তুর দুই চক্ষের গঙ্গাধারায়।

নিজেকে ব্রজরানী উজাড় করে বিলিয়ে দিয়েছিল পঙ্কজিনীর কাছে।

দুটি মাত্র বছর। তারপর আর খুঁজে পায়নি ব্রজ পঙ্কজিনীকে। ব্রজরাণীর ঘর ভেঙে সে নতুন ঘর বেঁধেছিল আর এক আনন্দ-সন্ধানীর সঙ্গে। যাবার আগে পঙ্কজিনী একটি কথাও জানিয়ে যায়নি ব্রজকে। উধাও হয়ে গিয়েছিল চুপিচুপি।...

ব্রজ হা-হুতাস করেনি। মদ ধরেছে তারপর থেকে।...

আরও বলেছিল ব্রজরাণী মধুময়কে। সে-কথা সে বটুকদাসকে জানায়নি। বলেছিল ঃ মনে হয়্যেছিল, জানো মাস্টার, ছেড়্যে দিব ই পোড়ার মেয়্যে সাজা।

ঃ ছাড়লেনা কেন?

ঃ পারি নাই মাস্টার, পারি নাই।

অকুণ্ঠ স্বীকৃতি জানিয়েছিল ব্রজ ঃ সিটা গেছে, তবু বেঁচে রয়েছি। গানের দলটি ছাড়িলে কিন্তু আর বাঁচিব নাই।

ঃ কেন?

অপার বিস্মিত হয়েছিল মধুময়।

ব্রজরাণী জবাব দিয়েছিল ঃ ই ছলার এ্যাক্টিং-টি যে মোর রক্তের সাথে মিশে রইছে মাস্টার। তুমি জান নাই—কেউ জানে নাই—আমার বাপটি ছিল গানের দলের নামকরা বিবেক, আর মাটি ছিল বটে ঝুমুরওয়ালী। একা আমি, পারিব কেনে কও উয়াদের দুজনার সাথে?...

মধুময়ের মুখে কথা সরেনি।

একটু পরে আবার জিজ্ঞাসা করেছিল ব্রজরাণীঃ আচ্ছা মাস্টার, উ হারামজাদি কেনে পালাইছে কও তো? আমার ভালবাসায় কি তার মনটি ভরে নাই? ভালবাসা তবে আর কারে কয় মাস্টার?

একথারও জবাব দিতে পারেনি মধুময়।...

ব্রজরাণীর শেষ কথাটার জবাব সেদিনও দিতে পারেনি মধুময়, আজও পারবে না। কী করে পারবে?

শেষ প্রশ্নের কী জবাব আছে? ভালবাসার রূপ আর স্বরূপ নিয়ে ব্রজরাণীর ঐ জিজ্ঞাসাই তো চিরকালের মানুষের শাশ্বত জিজ্ঞাসা। ঐ জিজ্ঞাসার জবাবে কত গবেষণা আর বাদ-প্রতিবাদ ঐ জিজ্ঞাসার ব্যাখ্যায় রচিত হোল কত কাব্য, কত নাটক, কত গল্প উপন্যাস। জিজ্ঞাসা তবু আজো সেই অতৃপ্ত অনুত্তর জিজ্ঞাসাই রয়ে গেল। সমাধান হোল কই? কই থামলো চির বিরহীর ক্রন্দসী? ও চাওয়া পাওয়ার শেষ ব্যালান্স-সিট তৈরি করবে কোন হৃদি-বিদ্?

সৃষ্টি আর সভ্যতার সেই প্রথম দিন থেকে ভালবেসেছে যত মনু আর মানবী।—কতরূপে তারা কতবার আনাগোনা করেছে তোমার আমার মধ্যে। তুমি-আমিও তো সেই মনু-মানবীরই তরঙ্গায়িত ভগ্নাংশ আর রকমারি রূপান্তর।

কী দেখেছি তুমি-আমি? কী আমাদের অভিজ্ঞতা আর উপলব্ধি?

সেই একই জবাব পাবে। সেই মনু-মানবীর সেই পুরোনো জবাব। মিলন আছে। বিরহও আছে। অবিকৃত আছে আজো সেই চাওয়া-পাওয়ার অ-শেষ দ্বন্দ্ব।

কেউ বলবে,—বিচ্ছেদ আর বিরহই হোল ভালবাসার সাগর-ছেঁচা অমৃত।

কেউ বলবে—ভালবাসায় আছে অভিশাপ, আর বিচ্ছেদ হোল সেই অভিশাপেরই প্রতীক।

কিন্তু সে কোন ভালবাসা ? এমন ব্যাপক অর্থের শব্দ আর কী আছে ?

কতরূপে ভালবাসার পরিচয়, তার কি হদিস আছে ? পুরুষ ভালবেসেছে নারীকে প্রিয়ারূপে। সেখানে অভিশাপ দেখা দিয়েছে। মা ভালবেসেছে সন্তানকে। সেখানেও সেই অভিশাপই বহে এনেছে সক্রন্দন অকরুণ পরিণাম। মানুষ ভালবেসেছে মানুষকে। তার পরিণাম ঘটেছে বিয়োগান্ত ট্র্যাজেডিতে।

তবে ?…

ভাবতে ভাবতে বারবার মধুময়ের মনে পড়েছে অনেক পুরোনো একটা প্রেমের গল্প। বিশ্ব-সাহিত্যে প্রেম-কাহিনীর অভাব নেই। অমর হয়ে আছে কত প্রেমকথা। মধুময় পড়েওছে তার অনেক কিছু।

তবু এই অখ্যাত গল্পটা মধুময়ের ভাল লাগে। খুব ভাল লাগে।

একটি তরুণ ভালবেসেছিল একটি কুহকিনীকে। আত্মহারা ভালবাসা।

কুহকিনী বল্‌লো ঃ তুমি যে সবার চেয়ে বেশি ভালবাসো আমায়, তার প্রমান ?

তরুণ বললো ঃ কী প্রমান চাও ?

ঃ যা চাইবো, তাই দেবে ?

ঃ যদি তা মানুষের অসাধ্য না হয় ?

ঃ বেশ।

কুহকিনী নির্মম অস্ত্র হান্‌লো ঃ এনে দিতে পারো আমাকে তোমার মায়ের হৃৎপিণ্ড ?

আত্মহারা প্রেমিক ছুটলো তখনি কুহকিনীর আদেশ পালন করে তার ভালবাসার প্রমান দাখিল করতে। হত্যা করলো সে মা-কে,

উপড়ে নিল সেই মায়ের রক্তাক্ত স্নেহোষ্ণ হৃৎপিণ্ডটা। ছুটলো তা নিয়ে মানসীর পায়ে উপহার দিতে।

ছুটতে ছুটতে হঠাৎ হোঁচট খেল আত্মহারা প্রেমিক। আছড়ে পড়লো সে ধুলোর ওপর কঠিন মাটির বুকে। মায়ের হৃৎপিণ্ডটা তার হাত থেকে ছটকে পড়লো ঈষৎ দূরে।

আঘাতের যাতনায় ককিয়ে উঠলো প্রেমিক ঃ উঃ মাগো!

সঙ্গে সঙ্গে সস্নেহে নারীকণ্ঠে কে যেন বলে উঠলো ঃ আহা বড্ড লেগেছে?

চমকে চারদিকে ফিরে তাকাল আত্মহারা প্রেমিক।

আর কেউ নয়। হস্তচ্যুত সেই মাতৃহৃদয়টিই তখনও জিজ্ঞাসা করছে! কোথায় লাগলো সোনা?

ভাল লাগে ভীষণ ভাল লাগে মধুময়ের এই ছোট্ট গল্পটা।

একটা ভালবাসার গল্পে আত্মহারা ভালবাসার দুটো সার্থক রূপ। কিন্তু এর কোন ভালবাসাটাকে মধুময় বেশি নম্বর দেবে, কিছুতেই তা ও ভেবে ঠিক করতে পারে না।

আত্মহারা প্রেমিকের ভালবাসা, না আত্মহারা সেই মায়ের ভালবাসাকে?

কে বেশি আত্মহারা? কার ভালবাসা বেশি উজ্জ্বল?

কোন কষ্টিপাথরে তার বিচার হবে? রায় দেবে কোন দুঃসাহসী জহুরী?···

রায় দিতে পারেনি মধুময় ব্রজরাণীর সমস্যায়। রায় দিতে পারেনি লালুঘোষের সমস্যাতেও। সমাধান খুঁজে পায়নি মধুময়। বরং ধাঁধাটা আরও ঘোরালো হয়ে উঠেছিল ওর কাছে।

ভালবেসেছিল ব্রজরাণী। আত্মহারা ভালবাসা। ভালবেসে ছিল লালুঘোষও। সে-ও আর এক আত্মহারা ভালবাসা। রূপ

আর স্বরূপ আলাদা হলেও, দুটোই আত্মহারা ভালবাসা। দুজনের কারো বেলাতেই অমন বিস্মরণী সুধা মদেরও সাধ্য হয়নি সে ভাল-বাসা মুছে দিতে ওদের বুক থেকে আর মন থেকে। তবু—

এখানেও কাকে বেশি নম্বর দেবে, তা আজও ভেবে পায় না মধুময়। কোন দুঃসাহসে কাকে সে ছোট করে কাকে বড় করবে ?..

সন্ধ্যে তখন ঘোর হয়ে নেমেছে।

মধুময় দেখতে পেলো, লালুঘোষের ঘরে ঢুকলো ছোকরা চাকর দাশু।

কৌতূহল দেখা দিল মধুময়ের মনে। পায়ে পায়ে সে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে ঘরের দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো। সেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায় ঘরের ভিতর অনেকখানি। শোনা যায় সব কথা।

দাশু ডাকলো ঃ লালবাবু !

একটিবার মাত্র পরম তাচ্ছিল্যভরে তার পানে চোখ তুলে দেখে নিয়েই আবার নিজের কাজে মন দিল লালমোহন ঘোষ।

আবার ডাকলো দাশু ঃ লালবাবু !

ঝাঁঝিয়ে উঠলো লালমোহন ঃ চোপরও শূয়ার !

ঃ আসরে যন্তর চলে গেছে। ম্যানেজারবাবু আপনাকে উঠতি কইছেন !

ভয়ে-ভয়ে দাশু আত্ম ও নিত্য কর্তব্য পালন করলো। পেশাদার যাত্রাদলের অন্যতম অলিখিত আইন,— নম্বরী আর্টিস্টকে সাজঘরে যাবার আগে অন্ততঃ একটিবার ডাক দিতেই হবে।

ঃ গরজ থাকে শালার ম্যানেজার নিজে এসে বলুক ! আমি কারো বাপের তাঁবেদার নই। এঃ, শালা ম্যানেজার যেন আমার 'ইয়ে' !

'ইয়ে'-টা ভদ্রমুখ, ভদ্রকাণ, আর ছাপার অক্ষরে সমান বেমানান আর অচল।

লালমোহন আবার ব্যস্ত হয়ে পড়লো বাধাহত আরব্ধ কাজে।

দাশু বুঝলো, আর ঘাঁটানো নিরাপদ নয়। এরপর আর হয়তো মুখ নয়, হাত চলবে লালবাবুর।

ফিরে গেল সে।

মেটে একটা ঘর।

ধুলোভরা কাঁচা মেঝেয় একটা তেলচিটে-পড়া বিছানা পাতা। তার ওপর লালমোহন—। শিথিল দেহ। মিট্‌মিট্ করে জ্বলছে একটা ইঞ্চি দেড়েক সরু মোমবাতি,—উপুড়-করা একটা মাটির ভাঁড়ের ওপর।

লালমোহন ঘোষ পাচার করে চললো মদ। বোতল থেকে ভাঁড়ে। ভাঁড় থেকে গলায়।

সকাল থেকে আজ একটানা চলেছে তার এই পানপর্ব। সারা-দিনে যতবারই মধুময় গেছে এইখান দিয়ে, ততবারই ঐ একই দৃশ্য তার নজরে পড়েছে।

'দি নিউ রয়েল অন্নপূর্ণা অপেরা পার্টি'-র সেরা রোমান্টিক অ্যাক্টর হোল লালুঘোষ। শুধু এ-দলই নয়, সারা পেশাদারি যাত্রা-মহলে তার নাম রটেছে 'দুর্গাদাস'।

হাঁ, আছে বৈকি। সবকিছু আছে। এজগতেও 'দুর্গাদাস' আছে, 'বাণীবিনোদ' আছে, 'কিন্নরকণ্ঠ' আছে, 'নট-দিবাকর' আছে, 'নাট্যসম্রাজ্ঞী' (পুং) আছে, 'সর্বস্নেহধন্যা' মন্দ নায়িকাও আছে। নিজের এলাকায় খ্যাতি-প্রতিপত্তি ওদের কারও কম নয়।

তাই লালুঘোষ হোল এ-মহলের 'দুর্গাদাস'।

তাকে দলে পেলে যে কোনও দল ধন্য হয়। খাঁইও তার মুঠো-মুঠো। তা হোক। ওদের হিসেবে সেটা অপব্যয় নয়। লালু-

ঘোষের নামেই সেটা উসুল হয়ে যায় বিশগুণ হয়ে বায়নার টাকার অঙ্কে।

সব ভাল। শুধু যা ঐ মদ আর জুয়ার নেশা।

আশ্চর্য। মধুময় অবাক হয়ে দেখেছে,—যাত্রাদলে প্রায় সবার মধ্যেই ও-দুটো উপসর্গ সমানভাবে বর্তমান। ওখানে ওরা সবাই শ্রীক্ষেত্রবাসী। ছোট বড়য় তফাৎ নেই।

অবিশ্যি নেশা করে লালুঘোষকে কেউ কোনদিন আসর মাটি করতে দেখেনি। শোনেওনি। মদের বোধহয় সে-ক্ষমতাও নেই।

বটুকদাস বলেঃ তুমি কইছ কী হে মাস্টার? নেশা ধরিবে উই মোর প্রাণসখা লালুঘোষের? যে-জলে উই মহাদেব চান কর্‌য়ো, বুঝিছ হে, এক গণ্ডুষ সিটা দেখ্যো কেনে একদিন চেখ্যে। নেশায় বুদ হয়্যে যাবে হে। দুটি চক্ষ্যে নেম্যে আসিবে আদালতের শিল-মোহর—হাঁ!

কথাটা সত্যি। মদ খেলে লালুঘোষের অভিনয় বরং আরও খোলে। আর জুয়াও খেলে সে নিজের রোজগারে। তাতে কার কী বলার থাকতে পারে?

বিপদ হয় তাকে সামলানো। এক মাত্র ম্যানেজার-অধিকারী বটুকদাস ছাড়া আর কারও সাধ্য নেই তার মর্জিমাফিক মানিয়ে চলার। গ্রাহ্যও করে না লালুঘোষ আর কাউকে।

ব্যতিক্রম শুধু মধুময়। ওকে সমীহ করে চলে লালুঘোষ। মদ খায় ওর দিকে পিছু ফিরে। সিগ্রেটের ধোঁয়া ছাড়ে হাত আড়াল করে। পারতপক্ষে ওর সামনে মুখ খারাপ করে না।

মাঝে মাঝে তার উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে দলের দু-আনি অংশীদার ও দালাল হলধর সানা।

ম্যানেজার বটুকদাসকে ডেকে বলেঃ তুমার উই লালবাবুটিই কুন দিন বিদেশ-বিভুঁইয়ে ইমন দলের ভরাডুবিটি করাইবে হে ম্যানেজার, মিলায়্যে নিও কেনে মোর কথাটি!

বটুকদাস ধমক দেয় ঃ তুমি থাম দিকি হে ছোট অধিকারী ! যি গাইটি দুধ দিবে কেঁড়ে ভরো, সিটার একটু তুয়াজ করিবে নাই ?···

দলের আর সব বীর-মহাবীরেরা জ্বলে মরে।

বলে ঃ হ্যাঃ, অ্যাক্টো কর‍্যো তো ফাটায়্যে দিছে। উই লালমুলো চেহারাটিতেই যা আসর মাৎ ! তা না হল্যে···

ওদের কথাগুলোও অবিশ্যি একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়।

তবু একথাও মিথ্যে নয় যে মাঠ জমাতে লালুঘোষের জুড়ি নেই। তার প্রবেশ-মাত্রই হাততালি সুরু হয়ে যায়। হাততালি আদায় করতে লালুঘোষ অদ্বিতীয়। বাজি রেখে অনেকবার সে অতি নগণ্য প্রায় নির্বাক চরিত্রেও শুধু কারদানির প্যাঁচে আর পশ্চার মেরে মুহুর্মুহু হাততালি আদায় করে বহু জনকে অবাক করে দিয়েছে।

দাশুর ব্যর্থতায় এবার মধুময়কে সঙ্গে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢোকে বটুকদাস নিজে।

মিষ্টি করে ডাকে ঃ লালবাবু ! ও লালবাবু হে— !

ঃ বলো শালা !—লালবাবু জবাব দেয় ঃ মদ খাচ্ছি মুখে, কানে নয়।

মদের মুখে এই হোল লালুঘোষের সবচেয়ে মিষ্টি সম্ভাষ।

ঃ ইবার উঠো হে ! শেষে সিনটি ফেল হইবে নাকি আজ ?

ঃ লালুঘোষ কবে সিন ফেল করেছে রে মিথ্যুক বেইমান শাঁহাকা ? জবান বাঁধকে কথা বলবে ম্যানেজার।—

রক্তচক্ষু মেলে শাসায় লালুঘোষ ঃ আমার ওপর খবরদার আমার 'ইয়ের' ম্যানেজারী ফলাতে আসবে না বলে দিচ্ছি।

'ইয়ে'-টা এবারও সমান অকথ্য আর অশ্রাব্য।

বটুকদাস ওকে চেনে। এই কাজ করে করে সে ঘুণ হয়ে গেছে। জানে, কোন সাপকে কোন্ মন্তরে পোষ মানাতে হয়।

তাই বলে: আহা, কী ছাইপাঁশ ওগুলা গিলিছ হে! 'নায়েক' আজ বলিছে, গান যদি যশের হয়, তুমারে দিবে খাঁটি এক-বোতল বকশিশ!

'নায়েক' অর্থে বায়নাদার।

: দেবে?—

অবিশ্বাসভরে জিজ্ঞাসা করে লালমোহন।

: দিবে হে, দিবে।

: গুল দিচ্ছ না তো বাওয়া?

: হাই লাও, শুন কথাটি মোর লালবাবুর!

অপার বিস্ময়ে যেন ডুকরে ওঠে বটুকদাস: আহা, অ্যাখুনও ছুটি মিনিট হয় নাই, উয়াদের নায়েবটি এসে বলে গেছে হে!

: মাইরি?

তীর্যক দৃষ্টিতে লালুঘোষ তাকায় বটুকদাসের দিকে। আর তার ফলে এতক্ষণে প্রথম ও টের পায় মধুময়ের নিঃশব্দ উপস্থিতিটা। সঙ্গে সঙ্গে লালুঘোষ যেন শরাহতের মতন ছটফট করে ওঠে। ত্রস্ত হাতে ভাঁড়-গেলাসগুলোকে আড়াল করার প্রচেষ্টায় সশব্দে বোতলটাকে উলটে ফেলে। কাঁচা মেঝের ওপর গড়িয়ে পড়ে খানিকটা তরল গরল। দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে ঘরের গুমোট বাতাসে।

আর্তকণ্ঠে বলে ওঠে লালুঘোষ: তুমি—তুমি এখানে কেন এসেছ মাস্টার? পালাও! ছোপ লেগে যাবে যে গায়ে।

মধুময় বলে: তুমিও চলো।

: আমার আর তোমার চলা এক নয় মাস্টার, পথও আমাদের এক নয়।—অসহিষ্ণুকণ্ঠে এবার যেন ধমকে শাসন করতে চায় লালুঘোষ: তুমি এসো না এপথে। পালাও মাস্টার, বাঁচতে যদি চাও, তাহলে এখনও পালাও এখান থেকে—এই যাত্রাদলের নরক থেকে।

এই প্রথম নয়! বার বার লালুঘোষ ওকে বলেছে এই কথা।

বার বার ওকে সে সাবধান করে দিতে চেয়েছে।

মধুময় বলে : ওসব কথা পরে হবে। এখন তুমি চলো।

গভীর হতাশায় ঘাড় নেড়ে লালুঘোষ গুম্‌রে ওঠে : নাঃ, উদ্ধার তোমারও নেই মাস্টার। বুঝতে পারছি, নরক তোমাকেও টানছে। আমার কথা এখন কানে যাবে কেন? ভেরী গুড বাওয়া! এরপরে আর যেন আমায় দোষ দিও না মাস্টার!

বটুকদাস তাড়া লাগায় : তুমি উঠো দিকি আগে হে, উঠো!

: ওঠো-ওঠো তো তখন থেকে সাতশোবার হচ্ছে শালা!

—খিঁচিয়ে ওঠে আবার লালুঘোষ : ধরে তুলেছিস?

ব্যস্তভাবে বটুকদাস হাত লাগায় লালুঘোষকে ধাতস্থ করে তুলে দাঁড় করাতে।

উঠে দাঁড়ায় বেসামাল লালুঘোষ ম্যানেজারের কাঁধে ভর দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে অগোছাল ধুতিখানা খসে পড়ে তার কোমর থেকে। হকচকিয়ে যায় বটুকদাস। তাড়াতাড়ি সে হাত বাড়িয়ে কোমর থেকে মেঝের মাঝপথে চেপে ধরে লালমোহনের ধুতিটিকে।

: এঁটে দে!

নির্বিকার হুকুম চালায় লালুঘোষ।

নির্বিচারে ম্যানেজারও পালন করে সে-আদেশ।

তারপর বলে : চলো ইবার।

টল্‌তে টল্‌তে চোখবুজে আর ম্যানেজারকে আঁকড়ে ধরে ঘর থেকে মেটে রুক্ষ পথে বার হয়ে পড়ে লালুঘোষ।

দু-চার পা হেঁটেই মুদিত নেত্রেই আবার সে বলে ওঠে : কোন্‌-দিকে তোমার "গিরীণরূম" বাওয়া? সবই তো অন্ধকার—বেবাক "ব্যালাক্"। হাত ধরে যেন বিপথে নিয়ে যেওনা সখা!

পথ লালুঘোষকে খুঁজে নিতে হয় না। বটুকদাস জানে, মধুময়ও দেখেছে, এহেন মাত্রায় অমৃত সেবনের পর সেক্ষমতা লালুঘোষের কস্মিনকালেও থাকে না। তাই নিজের কাঁধেই লালুঘোষের অতবড়

বেসামাল দেহটার ভর নিয়ে তাকে সাপটে ধরে এগিয়ে চলে বটুকদাস সাজঘরের দিকে।

যেতে যেতে হঠাৎ আবার শিবনেত্রে লালুঘোষ শাসায়ঃ ছ্যাখো শালার ম্যানেজার, হোঁচট যদি খাঁইয়েছ—মাইরি বসে পড়বো আমি সেখানেই গিরি-গোবর্দ্ধন হয়ে! কোন্ হারামী আর ওঠে সেখান থেকে তোমার ঐ "ইয়ের" যাত্রার পিণ্ডি চটকাতে—হাঁ!

আশ্বাস দেয় বটুকদাসঃ তার আগে মোর কলিজাটি বিছায়্যে দিব না হে তুমার হাঁটাপথে!......

যাত্রা আরম্ভ হয়ে গেছে।

রাঢ়প্রদেশের আদিগন্ত রুক্ষ অসমতল মাঠের মাঝে গোটাকতক আছোলা কাঁচা শালের খুঁটির ওপর একখানা ছেঁড়া চট টাঙানো; নিচে একটা শতছিন্ন শতরঞ্চি পাতা। এই হোল আসর। শতরঞ্চির একদিকে পাশাপাশি একটা হাতলভাঙা কাঠের চেয়ার আর একটা শালুঢাকা প্যাকিং বাক্স—রাজারানীর সিংহাসন।

দর্শকদের বসবার ঠাঁই ধূ ধূ উন্মুক্ত প্রান্তরে।

আসরে টাঙানো আছে কটা কাঁচভাঙা ডে-লাইট। ধোঁয়া বার হচ্ছে সবকটা থেকেই কারখানার চিমনির মতন। তারই আলোয় যতদূর দেখা যায়—জনসাগরের অনড়, জমাট ঢেউ।

এখানে নেই সহরের সভ্যতা। মানুষ আর প্রকৃতি যেন একাঙ্গে আর একাত্মে মিশে গেছে। ওরা এসেছে খালি গায়ে। কারো গামছা কাঁধে। বসবার জন্যে যে যার বাড়ি থেকে বয়ে এনেছে তালাই, চট, আর পিঁড়ি। অনেকে কিছুই আনেনি। মহোৎসাহে ওরা বসে পড়েছে পরমানন্দে সেই এবড়ো-খেবড়ো গৈরিক মাটির ওপরেই।...

যাত্রা গোড়া থেকেই জমে গেছে নাচ-গান-যুদ্ধু আর পোষাকের ঝলমলানিতে।

তবু সবাই অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে—কখন আসবে লালুঘোষ।

প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে ঘটলো তাদের নিরুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষার অবসান। আসরে ঢুকলো লালুঘোষ—রাজশ্যালক,ও লম্পট মত্তপ সেনাপতি চক্রসেন-রূপে। তার সঙ্গে সঙ্গে ঢুকলো সুরাপাত্র-হাতে নৃত্যপরা সখীর দল।

হাততালি আর শিষের আওয়াজে কান পাতা দায় হোল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর অকস্মাৎ আবার নীরব, নিথর হয়ে গেল সারা আসর। রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে সবাই গিলতে লাগলো যেন চক্রসেনের প্রতিটি সংলাপ, নিষ্পন্দনেত্রে সবিস্ময়ে দেখে চললো তার যত অনুপম "পশচার্" আর "আর্ট্"। প্রতিটি সংলাপ তার সম্বর্ধিত হতে লাগলো উচ্ছ্বসিত করতালিরবে।

...চক্রী চক্রসেনের চক্রান্তে রাজ্যের রাজা তার হাতের পুতুল। অরাজক রাজ্যে নটি আর সুরার মত্তমাতনে প্রতিরাতে প্রমোদোদ্যানে বসে চক্রসেনের বিলাস-বাসর। সে আসরে মাঝে মাঝে তার অনুগত অনুচরেরা জোর করে ধরে আনে রাজ্যের অনেক সুন্দরী পুরনারীকে। চক্রসেনের লুব্ধ দৃষ্টি ও ক্রুদ্ধ কবল থেকে কারো নিস্তার নেই। যমের মতন ভয় করে তাকে সারা রাজ্যবাসী।

শাসন মানে না শুধু কবি-জায়া কঙ্কণা। বারবার সে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে চক্রসেনের যত লোভনীয় প্রস্তাব আর উপেক্ষা করেছে তার সমস্ত ভীতি-প্রদর্শনকে।

ইচ্ছা করলে চক্রসেন কবি বিনায়ক আর দুর্বিনীতা কবিজায়া কঙ্কণাকে অনায়াসে হত্যা করতে পারতো। করেনি। পণ ধরেছে—যেমন করেই হোক্, ঐ অনমিতাকে একদিন সে পদানত করবেই। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে চক্রান্তের পর চক্রান্তজালে সে বিপর্যস্ত করে তুলতে থাকে কবি-দম্পতিকে।

দীর্ঘ দুটি বছরের চক্রান্তের পর কঙ্কণা সম্মত হয়েছে চক্রসেনের প্রস্তাবে।...

নর্তকীদের নাচ-গান শেষ হতেই জনৈক অনুচর এসে সংবাদ দেয়: কঙ্কণা প্রমোদোদ্যানে উপস্থিত।

চক্রসেনের আদেশ: পাঠিয়ে দাও!

প্রবেশ করে ছিন্নবাসা কঙ্কণা। অপমানে, লাঞ্ছনায় আর তিরস্কারে তাকে বিপর্যস্ত করে তোলে চক্রসেন। নিরুপায় নারীর দু'চোখে নামে অশ্রুবন্যা।

সুতীক্ষ্ণ শ্লেষে জিজ্ঞাসা করে চক্রসেন: আজ কেন এলে ওগো সুন্দরী সতী-শিরোমণি? স্বর্ণের বিনিময়ে এমন অমূল্য সতীত্ব—সম্পদকে বিক্রয় করতে আজ কেন নেই তোমার কোনও লজ্জাদ্বিধা?

অশ্রুমুখী কঙ্কনা বাঁ-হাত নেড়ে (পেশাদার নারীচরিত্রে পারতপক্ষে ডান হাত নাড়া বারণ) অশ্রুসিক্ত থরথর-কণ্ঠে জবাব দেয়: তুমি—তুমি বুঝবে না লম্পট, হাত পেতে তোমার স্বর্ণমুদ্রা নিতে কী মর্মভেদী হাহাকার উঠেছে আজ আমার এই বক্ষে? (হাততালি) আমি নারী, আমি পত্নী, কিন্তু সবার উপরে আমি মা। (হাততালি) অর্থাভাবে, অনাহারে, আজ আমার নয়নের মণি, আমার হৃদয়ের দুলাল, আমার একমাত্র শিশুপুত্র আজ মৃত্যুশয্যায়। (বেহালাদার এফ্ সার্পে আশোয়ারী আলাপ ধরে) তাই—ওরে অত্যাচারী নিষ্ঠুর, তাই আমার সেই প্রাণাপেক্ষা প্রিয়ধন কুণালের প্রাণরক্ষার জন্যেই আমি এভাবে আজ—

: কী—কী নাম বললে?

চমকে উঠলো চক্রসেন।

: কুণাল।

: কুণাল! কু—ণা—ল...

অকস্মাৎ কী যেন ঘটে যায় চক্রসেন-বেশী লালুঘোষের। যেন প্রবল একটা কোন্ প্রাণান্তকার দ্বন্দ্ব তার মধ্যে। আপাতমস্তক তার

কাঁপতে থাকে ঠক্‌ঠক্‌ করে। টলতে থাকে অটল চক্রসেন। সে যেন ভুলে যায় স্থান, কাল, পাত্র, পরিবেশ,—সবকিছু।

মৃদু কম্পিতকণ্ঠে শুধু বলে চলে: কুণাল!...বাঁচবে না?... মৃতুশয্যায়?...সত্যি বাঁচবে না?...

কঙ্কণারূপী ললিতা-সখী ঘাবড়ে যায় লালমোহনের এ হেন আচরণে।

কী সব যাতা আজ বলছে চক্রসেন?.. কই এসব নম্বর (সংলাপ) তো পার্টে নেই!...

বেসামাল হয়ে সে ধর্‌তাই (কিউ) হারিয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

ওদিকে তখনও আত্মবিস্মৃতের মত লালমোহন সটান বলে চলেছে: কুণাল বাঁচবে না?...না না, তা হবে না! কুণালকে বাঁচাতেই হবে।...আমি পারবো না,—এ আমি সইতে পারবো না! না—না—না—!

বলতে বলতে লালমোহনের ত্রস্ত প্রস্থান।

বেচারা ললিতা-সখী প্রায় কেঁদে ফেলে।

এ যে অভাবনীয় ব্যাপার। "ফাউল" করবে লালুঘোষ এমনি করে? যাত্রাদলের আইনে "ফাউল" করা বা "ক্যাচ্‌-ওয়ার্ড্‌" না বলা যে গর্হিততম অপরাধ, তাকি সে জানে না? "নম্বরী অ্যাক্টর" বলে লালুঘোষ পীর নাকি?

রাগে, অপমানে আর অবরুদ্ধ আক্রোশে ফুলতে থাকে ললিতা-সখী।

অকস্মাৎ আবার দর্শকদের আশু প্রতিক্রিয়ার কথা মনে হতেই সে শিউরে ওঠে। একা এমন অবস্থায় আসরে আর মুহূর্তকাল অপেক্ষা করা উচিত নয় জেনে অসহায় স্ফুরিত অনুযোগে সে-ও ফুঁপিয়ে ওঠে: ভাল হইছে নাই কিন্তু লালবাবু! পার্টটি বল্যে যাও মাইরি। ইমন করে "ফাউল" করিলে আম্মো শালা একদিন

ইমন "লেগ্" দিব যে—হাঁ! মাইরি কইছি—।

বলতে বলতে কঙ্কণারও আসর থেকে ত্বরিত প্রস্থান।

দর্শকরা প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে বিস্মিত হয়। তার-পরেই হঠাৎ সুরু হয়ে যায় তুলক্লাম কাণ্ড।

কলরব।···টিপ্পনি।···ব্যাঙ্‌ডাক।···হাসি।···শিষ।··· হাত-তালি।···

ছোট অধিকারী হলধর সানা আসর জাঁকিয়ে বসেছিল দলের কেরামতিতে বুক ফুলিয়ে। হঠাৎ গতিক বেয়াড়া দেখে সে চটি-জোড়ার মধ্যে বাঁ-হাতের ছুটো আঙুল গলিয়ে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে আসর ছেড়ে ছুট দেয় সাজঘরের বিপরীত দিকে অন্ধকারে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে।

বটুক সামনে পড়তেই শুধু তাকে রুদ্ধশ্বাসে বলে গেল: পারো যদি, ইদিকটি সামলায়্যো হে! নিদেন পোযাকের বাস্কগুলো আর ঢোল-তবলা কটি যেন রক্ষা পায়।

বটুকদাস ছুটে আসে আসরে। সেখানে তখন দক্ষযজ্ঞ হচ্ছে।

গলার শির ফুলিয়ে তারস্বরে চিৎকার করে সে ধমকে ওঠে হারমোনিয়াম-বাজিয়ের ওপর: হাঁ করে্য কী অ্যামেচারী কাণ্ডটি করিছ বটে হে মাস্টার? বাজাও না কেনে কন্‌সার্ট।

চকিতে মাস্টারের হৃতচেতন ফিরে আসে।

পেশাদার যাত্রাদলে "অ্যামেচার"-এর মতন চরম অপমানকর অপবাদ আর নেই।

তারস্বরে আরম্ভ হয়ে যায় যন্ত্রমাধ্যমে অকথ্য "কণ্ঠশ্বাস"। হারমোনিয়াম, ঢোল, বেহালা, জুড়ি, কর্ণেট, ক্লারিওনেট,—পাল্লা দিয়ে সবাই সুরু করে সুর-সমন্বয় লয়-বেসুরো প্রতিযোগিতা। যেন হাজারখানেক ঝিঁঝিঁ, কাটঠোকরা, কোলাব্যাং, শীতলাবাহন আর চিল-শকুণ-এর প্রাণের দায়ে মৃত্যুবিভীষিকায় আকুল ভয়ার্তনাদ।

প্রায় মুক্ত-কচ্ছ বটুকদাস ছোটে সাজঘরের দিকে।

সেখানেও তখন ভুলক্রাম্ কাণ্ড বেধে গেছে।

একঘর লোক ভোঁতা ঢাল, তরোয়াল, খাঁড়া, বর্শা, ছোরা, ত্রিশূল, গদা, আর তীরধনুক নিয়েও সামলাতে পারছে না ললিতা-সখীকে। রাগে, অপমানে ললিতা যেন ক্ষেপে গেছে। দেহের নিম্নাঙ্গে তার শুধু একটা আণ্ডারপ্যান্ট, উর্ধাঙ্গের ব্লাউজ, পরচুল, পফ্., সব খুলে খুলে দিগ্বিদিকে ছড়াচ্ছে আর হাঁকছেঃ যাত্রা করিবে? "ইয়ে" করিবে! তুর ইমন গানের দলটির "ইয়ে" করিছে! "ইয়ে" করিছে ইমন লালমূলো "ইয়ে"-র। যেমন শালা "ইয়ের" অধিকারী, ত্যামুন হইছে আমার "ইয়ে"-র হিরোটি!...ইত্যাদি, প্রভৃতি।

বলাবাহুল্য, ললিতা-সখীর "ইয়ে"-গুলো অলঙ্কার-মাধুর্যে লালু-ঘোষের "ইয়ের" চাইতে ফ্যালনা নয়।

কাণ্ড দেখে বটুকদাস ধড়ফড় করে ওঠে।

দু'চোখ কপালে তুলে হুঙ্কার ছাড়েঃ হ্যাঁ, ফ্যালাওহে—সব ছিঁড়্যেকুট্যে তছনছ কর্যে ফ্যালাও! তারপরে আমি দলটি চালাইব বটে দেবরাজ ইন্দিরটিরে একটি ন্যাংট পরায়্যে আর উর্বসীরে ছাতার কানির উই জহ্লাদের আলখাল্লাটি পরায়্যে, না হে?

বটুকদাসের কণ্ঠস্বর কানে যেতেই ললিতা সখী মিনিটখানেক নীরবে ফ্যালফ্যাল করে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর আর পারে না বেচারা। লজ্জায়, অপমানে আর স্ফুরিত অভিমানে হঠাৎ কেঁদে ওঠে হাউহাউ করে।...

বটুকদাস জিজ্ঞাসা করেঃ ইটা কী হোল বটে লালবাবু?

লালুঘোষ সাড়া দেয় না।

অঘটনটার পর থেকে সেই যে সে একধারে মাথা হেঁট করে বসেছে তার মেক-আপ বাক্সটির কাছে, সে-মাথা আর সে উঁচু করেনি কথাও বলেনি একটা কারো সঙ্গে।

বটুকদাস এবার ঈষৎ তিক্তকণ্ঠে গুমরে ওঠেঃ ইটাই তালে তুমার

মনে ছিল হে ? মদ গিলে মাতাল হত্যে আর সময়টি পেল্যে নাই ? চিব্যালে কিনা আমারই কাঁচা মাথাটি ? ইস্, লালু ঘোষ আজ কিনা বেবাক নম্বরটি ভুল্যে গেল বটে মালের নেশায়। বলিহারী যাই হে !

পেশাদার, যাত্রাদলে "নম্বর" ভুলে-যাওয়া অপরাধের মার্জনা নেই।

ঘাড় তুলে লালমোহন চোখ তুলে তাকায় ম্যানেজারের দিকে।

অপার বিস্মিত হয় বটুকদাস।

লালমোহনের রক্তাভ ডাগর দু'চোখভরা টলটলে জলোচ্ছ্বাস।

অবরুদ্ধকণ্ঠে লালমোহন বলে : ভুলতেই চেয়েছিলুম ম্যানেজার। তবে নম্বর নয়। ভুলবো বলেই মদ গিলেছিলুম। সারাটা দিন আজ মদ ছাড়া আর কিছু খাইনি। কিন্তু—পারলুম না। যে-নামটা ভুলতে চাই, ললিতা আবার সেইটাই মনে করে দিলে।

: কী নামটি ললিতা তুমারে মনে করায়্যে দিচ্ছে হে শুনি ?

: কুণাল।

: কুণাল তো পালায় রইছে।

: আমার ছেলেরও নাম।

বটুকদাসের বিস্ময় এবার সীমা ছাড়াতে চায়।

কোনমতে জিজ্ঞাসা করে : হয়্যেছে কী সিটার ?

: অসুখ। বাঁচবে না বোধহয়। আজই সকালে চিঠি পেয়েছি ঐ আমার একমাত্র সন্তান ম্যানেজার—এই এ্যাতোটুকু। তাই—

খিঁচিয়ে ওঠে বটুকদাস : বড় কম্মোটিই করিছ হে।

পরক্ষণেই সে সাক্ষী মানে মধুময়কে : শুনিছ মাস্টার, শুনিছ মোর হিরোর কথাটি। দেখ্যে রাখো হে ই পোড়া গানের দলের মানুষগুলোর আক্কেলটি। ইস্, ইগুলা মুখে ভাত গিলে, না খড়-বিচুলি হে ?

একই টানে আবার সে মধুময়কে ছেড়ে লালু ঘোষকে নিয়ে পড়ে : বাঃ রে মোর হিরো ! বড় কম্মোটিই করিছ। ব্যাটার

তুমার ইমন ব্যামো, তা সিকথাটি আগে একটিবার জানাতে পার নাই ? মুখে কি তুমার বাক্যি হরে গেছিল হে ? ছুটি নিতে কি হয়্যেছিল হে গুণের নাগর আমার ? আগাম ট্যাকা নিতে পার নাই তার চিকিৎসার তরে ? মাল টেন্যে ভোম্ হয়্যে কী উপরকারটি করিলে হে তুমার নিজের আর ই হারামজাদা বটাইদাসের, সিকথাটি কওতো শুনি ?

: ছুটি এখন এই বিদেশ-বিভুঁই-এ বার হয়ে কে আমায় দেবে ম্যানেজার ? আর টাকা আমার পাওনা দূরে থাক্, আগাম নিয়ে যা দেনা করে রেখেছি, সারা মরশুম খেটেও হয়তো তাই শোধ হবে না। চাইবো কোন্ মুখে ?

বটুকদাস এবার তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে : তুমারে চাবুক পিটাতে হয় সর্বাঙ্গে, বুঝিলে হে লালবাবু, সপাসপ নির্দয় চাবুক ! বিরাট একটি সবজান্তা হয়্যেছ তুমি, না হে ? চাইবা কুন মুখে ? যি পোড়ামুখটিতে মাল টানিতে পারে হুস্‌হুস্ করয়্যে, সি-মুখটি কি বোবা হয়ে গেছিল হে ? সি ভারটি তুমি দয়া করয়্যে ই মহাপাতক ম্যানেজার বটাইদাসের 'পরে চাপায়্যে দিয়্যে নিজের কম্মোটি তুমি মন দিয়্যে করিলে না কেনে মোর ধম্মোবাপ ? তুমার উচিত কম্মোটুকু তুমি যদি করিতে ই পোড়াবদন ম্যানেজারও তার কম্মোটি করয়্যে ধম্মোটুকু বজায় রাখিত কিনা ? ভদ্দরজনে মাতাল হল্যে—বুঝিলে হে মাস্টার—ভদ্দরজনে মাতাল হল্যে তার বিস্তর দোষ ঘটে। হাঁ, ইটা হইছে খাঁটি কথা।

লালুঘোষ আবার কী যেন বলার উপক্রম করে। ফুরসৎ দেয় না বটুকদাস !

ধমকে ওঠে : ব্যস্ হে, ব্যস্ ! ও ঘোড়াবদনে আর রা-টি কাড়িবে নাই। তালে আর তুমার মান-ইজ্জত অক্ষত রাখিবে নাই। বসো দিকি চুপটি করয়্যে। আমি ধাঁ করে সামাল দিয়্যে আসি উদিকটা।...

হন্তদন্ত হয়ে বটুকদাস আবার ছুটে যায় আসরের দিকে।···

সামাল দেয়ও বটে ম্যানেজার বটুকদাস।

কী করে যে দেয়, তা সে-ই জানে। তবে সব পারে ঐ বটুকদাস। যাত্রামহলে তাই ওর নাম রটেছে "বিশ্বকর্মা"। লোকে বলে, বিশ্বকর্মা নাকি ঝাঁটার কাঠির ডগায় আলু গেঁথে সেনাপতি সাজাতে পারে।

যাত্রা আবার আরম্ভ হয়ে যায় লালুঘোষের পার্ট আর এক-জনকে দিয়ে।

ঘন্টাখানেক পরে আবার ফিরে আসে বটুকদাস।

লালুঘোষ তখনও একই জায়গায় একই ভাবে বসে।

ফিসফিস করে বটুকদাস বলে: লাও, উঠো দিকি আমার ধরম বাপ! ভোর পাঁচটায় একটি গাড়ি রইছে। চলে যেও সিটায়। একটি হপ্তা পরে আবার খামারখন্দে দলে "জয়েন" দিবে।

কথার সঙ্গে সঙ্গে সে লালুঘোষের হাতে চুপিচুপি গুঁজে দেয় একগোছা নোট।

লালুঘোষ মুখে কিছু বলতে পারে না। দু'চোখ বেয়ে তার নেমে আসে অঝোর ধারা।

: হাই—হাই দেখ হে মাস্টার!

মধুময়কে আবার সাক্ষী মেনে যেন বটুকদাস তার সাহায্য কামনা করে।

: হাই দেখ হে কাণ্ডটি! বিটাছেলে কাঁদিবে কেনে? আহা, উঠো হে, উঠো দিকি!

লালুঘোষকে ঠেলে তুলে সস্নেহে তার পিঠে হাত রেখে বটুকদাস বলে চলে: ঘরে আস হে। একটুন্ আরাম কর্যে নিবে নাই? ভোরে আবার পাড়ি দিতে হবে নাই? দাশু যাবে তুমার সাথে বেডিং-সুটকেশগুলা মাথায় নিয়্যে। কোনও চিন্তা নাই তোমার।

উঠো হে, চলো—।

লালুঘোষকে দু'টি বাহুর বাঁধনে বেঁধে বটুকদাস তাকে পৌঁছে দেয় আস্তানায়।···

ভোর তখন হবো-হবো।

ঘুম জড়িয়ে এসেছে মধুময়ের সর্বাঙ্গ জুড়ে।

বটুকদাস এসে ধাক্কা দেয়।

: মাষ্টার ! উঠো, উঠো হে ! সর্বনাশ হইছে !

: কী হোল আবার ?

ধড়মড়িয়ে উঠে বসে মধুময়।

বটুকদাস বলে : নাই।

: কী নাই ?

মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারে না মধুময়।

: ঘরে নাই মোর ধরমবাপ্ !

রাগে যেন ফেটে পড়ে বটুকদাস : দাশু গেছিল মোট বয়্যে ইষ্টিশানে শালার হিরোরে গাড়ী ধরাবে বলে। দেখে,—কে কারে পৌছায়,—ঘরেই নাই মক্কেল।

: আশ্চর্য ! গেল কোথায় ?

মধুময়ও উৎকণ্ঠাকুল হয়ে ওঠে বটুকদাসের মতন।

: সিটা তো আমিও শুধাইছি হে, যেছে কুথায় ? আঁ, যেছে কুথায় ?···ওহোরে, হয়্যেছে !

একটা কোন অজানা আশঙ্কায় হঠাৎ আবার হুঙ্কার ছাড়ে বটুক দাস। মধুময় জিজ্ঞাসু চোখে ফিয়ে তাকায় তার দিকে। জবাব কিন্তু দেয় না বটুকদাস।

: এসো দিকি মোর সাথে !

খপ্ করে মধুময়ের একখানা হাত চেপে ধরে বটুকদাস ছুটতে সুরু করে শালবনটার আড়ালে মেলাতলার দিকে।···

মেলাতলা। সেই চিরাচরিত মেলা।

টানতে টানতে বটুকদাস মধুময়কে নিয়ে হাজির হয় সেখানে। তারপর চলে দিকে দিকে ভিড় ঠেলে খোঁজাখুজির পালা।

হঠাৎ বটুকদাস ককিয়ে ওঠে: হুই যে,—হোথায়!

বটুকদাসের আশঙ্কা অমূলক নয়।

লালুঘোষ টাকা হাতে পেয়ে আকণ্ঠ মদ গিলে ভিড়ে পড়েছে জুয়াচক্রে। সারারাত জুয়া খেলেছে। হৈ-হৈ মাতলামি করেছে। আবার খেলছে।

: লাল বাবু!

বটুকদাসের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে তিক্ততম তিরস্কার।

: চোপ্‌রও শালা!—

ধমকে ওঠে লালুঘোষ আবার একমুঠো নোট বাজি ধরে জুয়ার ছকে: বাজির দানে বাগ্‌ড়া দেবে না বলছি!

বাধা দেবার চেষ্টায় বটুকদাস বলে ওঠে: না না, আর খেলে নাই হে!

: আলবাৎ খেলবো! আমার টাকায় আমি খেলবো, তাতে তুমি শালা কথা কইবার কে হে? জবান্ বাঁধকে ম্যানেজার!

তেড়ে যেন মারতে এলো মাতাল লালমোহন ঘোষ।

: তুমার কুণাল?

শেষ চেষ্টা করলো বকাই ম্যানেজার।

: চুলোয় যাক্ সে হারামজাদা! যাক টেঁসে। বেঁচে থেকেই বা সে আমার কোন্ উপকারটা করবে বাওয়া? একদিন আমার বাওয়াও আমাকে রাজা-রাজড়া করতে চেয়েছিল। লেখাপড়াও শিখিয়েছিল। ভদ্রলোক অকালে মরেছেন। বেঁচে গেছেন। সগ্‌গে গেছেন। সেখনে থেকে ব্যাটার উন্নতি দেখে ভদ্রলোকের নিশ্চয়ই মুখ উজ্জ্বল হচ্ছে।

: লালবাবু !

: তা হয়েছি বাওয়া, হয়েছি !—জড়িতকণ্ঠে বলে চলে লাল-মোহন : রাজা হয়েছি। রাজপুত্তুর হয়েছি। সেনাপতিও হয়েছি বাওয়া তোমার যাত্রার দলে। আমার ছেলে বেঁচে থেকে এর বেশি আর কী হবে মাণিক ? যাত্রাওলা মাতাল লালুঘোষের ব্যাটা কি হবে বাওয়া তামাম হিন্দুস্থানের রাষ্ট্রপতি ?

নিজের রসিকতায় লালমোহন নিজেই জড়িত বীভৎসকণ্ঠে হো হো করে হেসে উঠে আবার জুয়ার ছকে বাজি ধরে হাতের মুঠোর শেষ নোট কখানা।……

ঐ বটুকদাস।

ওকে দেখেও বারবার অবাক হয়েছে মধুময়।

শরতের আকাশ-সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী আর বটুকদাসের স্বরূপ নির্ণয় করা সমান দুরূহ ব্যাপার বলে মনে হয়েছে মধুময়ের। মধুময় জানে, কোনও মানুষই নিছক আলো বা নিছক কালো নয়। আলো-কালোর একটা বিচিত্র রসায়ণ।

কিন্তু ক্ষণেক্ষণে আলোকালোর এমন ত্বরিৎ ঝলকানি মধুময় আর কারো মধ্যে দেখেনি। ঠিক যেন শরতের আকাশ ! সোনালী আলো আর কালো মেঘের মুহুর্মুহু বিকাশ। অথচ, আশ্চর্য ! আলো-কালো দু'টো সম্পর্কেই বটুকদাস সমান নির্বিকার আর অ-চেতন। বিকাশের পরমুহূর্তেই তার বিপরীত রূপ। মনেও থাকে না তার সে-কথা।

বটুকদাস যেন পুঁথির পাতা থেকে জীবন্ত ডাঃ জেকিল ও মিঃ হাইড হয়ে দেখা দিয়েছিল মধুময়ের সামনে। বাস্তবেও যে এমন রহস্যমানব,—ক্ষণে মানব আর ক্ষণে দানব সম্ভব,—তা যেন দেখেও বিশ্বাস করতে বাধতো মধুময়ের।

বস্তুতঃ আর কোনও মানুষ এত জ্বালাতন করেনি মধুময়কে।

লালুঘোষের ব্যাপারটায় বটুকদাসের সহৃদয়তায় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল মধুময়।

তারপরদিনই কিন্তু বটুকদাসের প্রতি বিতৃষ্ণায় ভরে গেল তার মন।

পাঁঠা কাটছিল বটুকদাস দলের জন্যে। পাঁঠা অনেকেই কাটে। বটুকদাসের কিন্তু অন্য আচার।

দু'হাঁটুর মধ্যে পাঁঠার শরীরটাকে ভীমবলে চেপে ধরে উবু হয়ে বসে সে ধীরে ধীরে মহাস্ফূর্তিতে তারিয়ে তারিয়ে ছুরি চালায় পাঁঠার গলায়। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছোটে। মরণার্তনাদে জানোয়ারটা ছট্‌ফট করে। আনন্দ তত বাড়ে বটুকদাসের। যেন একটা মজার খেলা পেয়েছে। যেখানে এক কোপে হ'তে পারতো সবকিছু সমাধা, সেখানে ধীরে ধীরে মৃত্যুকে আহ্বান জানায় বটুকদাস বন্য এক পাশব উল্লাসে রক্তাপ্লুত হয়ে।

সে যেন মানুষ নয়। একটা নররাক্ষস। বাস্তবায়িত মিঃ হাইড্। অন্যের মৃত্যুকে নিয়ে সে যেন পরমোল্লাসে লুকোচুরি খেলায় মেতেছে। কিছুতেই সাঙ্গ করতে চায় না সেই মর্মান্তিক নিষ্ঠুর খেলা। টেনে টেনে বাড়াতে চায় তার মেয়াদ।...

সহ্য করতে পারেনি মধুময় সে-দৃশ্য। ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল সেখান থেকে অনেক দূরে—যেখানে পাঁঠাটির মরণার্তনাদ তার কানে পৌঁছবে না!

মনে পড়ে গিয়েছিল মধুময়ের আর একটা কথা।

ডাকাত-বাবা বলেছিল: নিজেকে খুন করতে পারিনা, তাই পরকে জবাই করে বেড়াই।

ডাকাত-বাবার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল মধুময়ের।

কোথা থেকে যাত্রাগান সেরে ওরা ফিরছিল লরী বোঝাই হয়ে

চিরকুণ্ডা ব্রীজের ওপর দিয়ে।

কী যেন বিগড়ে গেল লরীর হৃদযন্ত্রে। নামতে হয়েছিল ওদের সেখানে। থাকতে হয়েছিল যতক্ষণ না লরী আবার চালু হয়ে ওঠে।

অবসর পেয়ে পায়ে পায়ে সবাই ছড়িয়ে গিয়েছিল চারিদিকে। মধুময়ও একা হাঁটছিল একটা পথ ধরে। সেখানেই একটা গাছের তলায় ভীড়ের মাঝে একজন সাধুকে দেখতে পেয়ে নিছক কৌতূহলের বশে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

ভীড় ভেঙে পড়েছিল চারদিক থেকে প্রণাম করার জন্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল। প্রণামী নিয়ে সাধাসাধি করছিল সবাই।

সাধু কিন্তু কিচ্ছু নেবে না। প্রণাম নয়। প্রণামী নয়।

মুখে শুধু তার একটানা একটা হুহুঙ্কার ঃ খবর্দার ! হুঁসিয়ার !···

সামনে একটা ধুনি। আর তার পাশেই মাটির ওপর প্রকাণ্ড একখানা চক্‌চকে্‌ ধারালো ছোরা।

সেই সাধুই ডাকাত-বাবা।

কৌতূহল বেড়ে গিয়েছিল মধুময়ের। জিজ্ঞাসা করেছিল অনেককেই। কেউ কোন সঠিক জবাব দিতে পারেনি। শেষপর্যন্ত একজন মাদ্রাজী ভদ্রলোক ওকে শুনিয়েছিল ডাকাত-বাবার ইতিহাস।

ভক্তিতে সাধু হয়নি ডাকাত-বাবা, ভগবানের সন্ধানে পথে বার হয়নি।

তবে ?

ছিল ঘোর সংসারী। সন্দেহবশে হঠাৎ একদিন ঐ ছোরা দিয়ে সে খুন করে বসে তার সুন্দরী প্রিয়তমাকে। ব্যস্, তারপর থেকেই ডাকাত-বাবার এই রূপ আর মুখে ঐ বুলি। সেই ছোরাখানাও তার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে।

কেন ?

কে জানে।

সেই ডাকাত-বাবা অনেক পরে নিরালায় পেয়ে ওকে বলেছিল : হাঁ বেটা, খুন করেছি। বেদরদে চাকু চালিয়েছি তার উপর যাকে হামি জান্ দিয়ে পেয়ার করেছি। কেন করিয়েছি শুনবি ?

: কেন ?

: হাপ্‌নাকে তো খুন করতে পারলো না, তাই ওকেই খুন করলো। আঁ, তাজ্জব লাগছে ?

অট্ট অট্ট হেসে উঠেছিল ডাকাত-বাবা মধুময়ের বিস্ময় দেখে।

হাসতে হাসতে বলেছিল : খবর্দার বেটা, খবর্দার! তুমার সবচেয়ে বড়া দুষমণ আছে তুমার ভিতর। ও-দুষমণকে জবাই করবে কৌন্ ? হুঁসিয়ার! খবর্দার! ভাগ্‌নে না পাবে ও-দুষমণ! হুঁসিয়ার! খবর্দার!···

এর বেশি আর কিছু বলেনি ডাকাত-বাবা।

বটুকদাসকে দেখে মনে পড়ে ডাকাত-বাবার কথাগুলো।

বিশেষতঃ একদিন যা হ'য়ে গেল, তাতে তো আর কোনও সন্দেহই রইল না মধুময়ের। ডাকাত-বাবার আধা-বোঝা কথা আর ইঙ্গিতটা প্রাঞ্জল হয়ে উঠলো তারপর থেকে।

টের পেলো,—সব মানুষের জন্যেই উচ্চারিত হয়েছিল ডাকাত-বাবার সেই হুঁসিয়ার ধ্বনি।

অন্ততঃ বটুকদাসের জন্যে তো বটেই।

দুর্ভাগ্য বটুকদাসের, ডাকাত-বাবার সঙ্গে তার দেখা হয়নি।

হলে হয়তো···

কিন্তু উপলক্ষ্যটাও যে ছিল সেদিন নেহাৎই অদ্ভুত।

চুরি যায় প্রায়ই। রাতের বেলায়। ধরা পড়ে না। কিচ্ছুতে না।

অধিকারী বটুকদাস চ্যাঁচামেচি করে: ই শালারে যিদিন পাকড়াবো বটে, টেংরি একখান খুলে নিব—হাঁ। আরে বাপ্, ই মহীরাবণের গুষ্টিরে গিলাতে আমি ফতুর হয়্যে যেছি হে! তবু সুমুন্দি চুরি করিবে? তাও আবার ভাত চুরি হেঁ? দিব শালার তল-প্যাটে বসায়্যে ছুই লাথ, আর দাঁতের পাটিটি উপড়ায়্যে নিব চৌচাপটে!

ভাত চুরি। অবাক কাণ্ড।

ছোট-বড় সমেত প্রায় চল্লিশজনকে নিয়ে দল। মরশুম-সময়ে—কালীপূজোর পর থেকে চৈত্র-সংক্রান্তি পর্যন্ত—ওরা ফেরে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

অবাক হয়ে ভাবে মধুময়।

একা হলেই ওর অসহ্য ঠেকে এর পরিবেশ, এদের প্রথা, আচার, আচরণ, সবকিছু।

বেশির ভাগই বাঁকুড়া বা মেদিনীপুরবাসী। সামাজিক ধাপও তাদের আদৌ উঁচু নয়। শিক্ষা-সংস্কৃতির বালাই নেই। পার্ট মুখস্ত করে শুনে শুনে তোতাপাখির মতন। নিজেদের সঙ্গে মধুময়ের তফাৎটুকু তারা বোঝে। অন্য সময়ে ওর সঙ্গে ব্যবহারে তাদের বেশ খানিকটা খাতির আর সম্ভ্রম মেশানো থাকে। রাতের বেলায় কিন্তু অন্য চেহারা। রঙ-কালি আর সাজ-পোষাকের কৃপায় তারা তখন ভোল পালটায় বড় বড় "বীর-মহাবীর"-এ। খোলা মাঠে বিরাট আসর গমগম করে ওঠে তাদের বীরদর্পে।

হাততালির ঝড়-বন্যা বয়ে যায়।

সে প্রতিযোগিতায় হার মানতে হয় মধুময়কে। নতুন অভিনেতা মধুময়। পাল্লা দিতে পারে না তাদের সঙ্গে। প্রতিরাতে তাই নিজের কাছেই ওকে স্বীকার করে নিতে হয় নিজের তুলনামূলক অসামর্থ আর অপটুত্বটুকুকে।

সহ-অভিনেতারা কিন্তু প্রকাশ্যে কেউ কোনদিন অমর্যাদা দেখায় না মধুময়কে। অধিকারী বটুকদাস পর্যন্ত নয়।

বটুকদাস নিজেই তার দলের অন্যতম "নম্বরী অ্যাক্টর" বা সেরা অভিনেতা। 'বিরাট লাশ। মিশ কালো। ইয়া বুকের পাটা। তেমনি গলা।' বাঁশফাড়া আওয়াজ। দৈত্য-অসুর-রাজার পার্ট তার বাঁধা। বিশেষ করে "বিধির প্রতিশোধ" পালায় তার ধৃষ্টসেনের পার্ট যা হয়—ফার্ষ্ট কেলাশ। সত্যিই অনুপম।

...গরিবের ছেলে ধৃষ্টসেন। দেবতার কৃপায় রাজা হোল।

ক্রমে লোপ পেল তার ভক্তি, সাধনা, সাধুতা। ধৃষ্টসেন হয়ে উঠলো বলদর্পী, দাম্ভিক, অত্যাচারী। ইষ্টদেবতার রোষে তাই আবার একদিন সর্বহারা এক পথের ভিখিরি হয়ে পড়লো ধৃষ্টসেন।

ভিখারী ধৃষ্টসেন স্ত্রীপুত্রের জন্যে দ্বারে দ্বারে একমুঠো অন্ন ভিক্ষা করে ফেরে।

ক্ষুধা-তৃষ্ণাতুর মুমূর্ষু সন্তানের আর্ত হাহাকারে তার বুক ফেটে যায়। ভিক্ষা কিন্তু সে পায়না। লোকে ব্যঙ্গ করে। বিদ্রুপভরে ঢিল ছোঁড়ে। মুখে তার থুৎকার দেয়!

অনাহারে শুকিয়ে কুঁকড়ে মারা যায় তার একমাত্র সন্তান।...

সত্যিই ভাল করে বটুকদাস ঐ ধৃষ্টসেনের পার্টটা। খাশা করে।

ওদের স্থূল অভিনয়ধারার সঙ্গে মধুময়ের মার্জিত রুচি আর ধারণায় একটুও মেলে না। কিন্তু বটুকদাসের "ধৃষ্টসেন" ওকে বারবার মুগ্ধ করে। জীবন্ত। প্রাণময়। বটুকদাস যেন মিশে যায় ধৃষ্টসেনের সঙ্গে একান্ত একাত্ম নিশ্চিহ্নে।

শেষদৃশ্যে—সন্তানের মৃত্যুকালে—অনুতপ্ত পিতার অসহায় মর্মভাঙা আক্ষেপে প্রত্যেকটি দর্শক কেঁদে আকুল হয়।

মধুময়েরও চোখ শুকনো থাকে না।

বারবার মধুময় অপার অবাক হয়েছে ঐ কাঠখোট্টা রুক্ষভাষী বটুকদাসের এহেন এক অবিশ্বাস্য রূপান্তর আর রূপায়ণ দেখে। যুক্তি

দিয়ে, ধারণা দিয়ে বিচার করে মধুময় কতবার বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছে এই আশ্চর্য নিখুঁত চরিত্রায়ণকে। হার মেনেছে প্রতিবারই।

অভিনয়ের বাইরে ও যতবারই দেখেছে বটুকদাসকে, শুনেছে তার কথা,—কিছুতেই আর তাকে কল্পনা করতে পারেনি ধৃষ্টসেন-রূপে।

বাড়ি ছিল বটুকদাসের বাঁকুড়া জেলায়। সংসারও নাকি করেছিল একদিন। আজ আর নেই।

বলে ঃ গেছে বটে উড়ে পুড়ে নিব্বংশ হয়্যে।

হ্যা-হ্যা করে হাসে। যেন কতবড় আনন্দের খোশখবর।

সব খুইয়ে আজ শুধু সার করেছে এই যাত্রার দল।

দোষ আছে বটুকদাসের অনেক। পাওনা কড়ি ফাঁকি দিতে বটুকদাসের জুড়ি নেই। মুখ নয়তো,—আঁস্তাকুড়। মাতাল। নির্মম! দলের লোককে কিন্তু না খাইয়ে রাখে না বটুকদাস। এন্তার খাওয়ায়। ভরপেট। দমভোর। ভালও খাওয়ায়। অন্য কোনও দলের খাওয়ার ব্যবস্থা মধুময় দেখেনি। শুনতে পায় এই দলেরই মানুষগুলোর মুখে, এমন চব্যচোষ্য খ্যাঁটনের ব্যবস্থা নাকি আর কোনও দলে নেই।

বটুকদাসের ঢালাও হুকুম আছে দলের রাঁধুনি চিন্তাঠাকুরের ওপর—যে যত পারে খাওয়াবে। খাওয়ার অভিযোগ তাকে যেন কোনদিন শুনতে না হয়। চিন্তাঠাকুর আর বাজার-সরকার গোলোক গোঁড়ার তাহলে রক্ষে থাকবে না…।

হুকুমের অন্যথা হয়না কোনদিন।

বেদুইনদের মতন অস্থায়ী তাঁবু-গাড়া চল্লিশজনের একটা স্থিতি-বিহীন গতিশীল সংসার। আজ এখানে। দুদিন বাদে অন্য কোনও-খানে। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে তাদের নিত্য পাড়ি।

বাড়তি আসবাবপত্তর আর 'ডেও-ঢাকনা' তাই সঙ্গে রাখা সম্ভব নয়। যেখানে যায়,—উনুন পাড়ে, কেনে মাটির নতুন হাঁড়ি-কলসী-

সরা-ভাঁড়। রান্না হয়। লকড়ির আঁচ। খাওয়া হয় কলাপাতে, শালপাতে বা পদ্মপাতে,—যা জোটে।

দুদিন বাদে হয়তো শেকড় তোলে যাত্রার দল।

পিছনে তখন রেখে যায় যত এঁটো হাঁড়ি-সরা-ভাঁড়-কলসী-পাতা। যেন দাহশেষে পরিত্যক্ত শ্মশান।

আয়োজন কম করতে হয় না।

প্রত্যেক বেলায় চল্লিশজনের রান্না। খাওয়াও তাদের অনেকের বিস্ময়কর।

মধুময় অবাক হয়ে দেখে আর ভাবে।

ওদের মধ্যে সবচেয়ে যে কম খায়, সে ও অন্তত মধুময়ের চারগুণ টানে। রাক্কোস এক একটি। অজগরের জঠর। গোগ্রাসে গেলে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অন্নের গ্রাস ভাগাড় করে লুফতে লুফতে ঠেসে দেয় মুখের মধ্যে। মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন। আবার। আবার।··

দ্রুততম হাতমুখ-চালনায় অন্ন-ব্যঞ্জন-অদৃশ্যকারী একটা যেন অত্যাশ্চর্য ইন্দ্রজাল।

মুহূর্মুহূ ডাক পরে ঠাকুরের। ঘনঘন ফরমাস। উপর্যুপরি। শুধু দাও আর দাও।

হিম সম খেয়ে যায় চিন্তাঠাকুর আর তার দুজন সহকারী।

তৃপ্তি নেই তবু ঐ ক'জনার। জীবনে তাদের যেন শুধু ঐ অতৃপ্ত নিঃসীম বুভুক্ষা ছাড়া আর কিছু সত্য নয়।

অন্যসময়ে এত ভাব সবার মধ্যে। জুয়া খেলবে একসঙ্গে। মদ গিলবে দল বেঁধে। পথচলতি পণ্যা-পল্লীতে হানাও দেবে গলা জড়াজড়ি করে। খাওয়ার সময় কিন্তু সেকথা ভুলে যাবে।

তর্ক।···ঝগড়া।···রেষারেষি।···গালাগালি।···

"পাটরানী" পঞ্চু পাড়ুইয়ের পাতের দিকে নজর পড়তেই "সেনাপতি" কেদার কয়ালের আমড়া চোখদুটো অকস্মাৎ ধক্ করে জ্বলে ওঠে।

বাজখাঁই হুঙ্কার ছাড়েঃ   ঠাকুর !

ঃ আজ্ঞা বাবু ?

সবিনয়ে জোড়হাতে ছুটে আসে চিন্তাঠাকুর।

ঃ আমার বেলা ছোট্ট টিকটিকে মাছের টুকরাটি, আর পঞ্চার উই অতবড়টি কেনে হে ?

ঃ ইটা তুর ডাগর মাছ হইছে নাকি রে শালা শকুন ?

খিঁচিয়ে ওঠে পঞ্চুরানী।

ওধার থেকে "বিদুষক" নরহরি সামুই টিপ্পনি কেটে ওঠেঃ তু শালা চিরটিকাল হুই ভোঁতা ত্যালোয়ার কাঁধে নিয়্যে ছুটাছুটিই করবি বটে। উন্নতি নাই তুর বরাতে।

ঃ কেনে ?

ঃ রানীর পাতে সেরা ভাগটি পড়িবে নাই তো কি তুর পাতে পড়িবে রে ? দলের রাজাটি যে অধিকারী নিজে বটে। আর সিটার মশারীর মধ্যেই যে রেতের বেলা রানীর সুখশয্যে পড়ে রে।

খ্যাঁক-খ্যাঁক করে পঙ্কিল হাসি হেসে ওঠে একপাল নেকড়ে-খ্যাঁকশেয়াল।

ঃ পড়েই তো। কেনে পড়িবে নাই রে মুখপোড়া ?

মেয়েলী ঢংয়ে চোখমুখ নাচিয়ে বিলোল কটাক্ষ হেনে মেয়েলী টিপ্পনি কাটে পঞ্চুরানীঃ বটুকদাস যে মোর মনের মানুষটি রে, নিত্যি রেতের সোয়ামী। ই কথাটি জানে নাই কে ?

দপ্ করে জ্বলে ওঠে কেদারঃ সিটা আর নতুন কর‍্যে কইছিস কি রে ? ইমন কতো বটুকদাসরে যে তু সোয়ামী কর‍্যে থুয়েছিস, সি হিসাবটি কি আমি জানি নাই ? ইবার কিন্তু মনে হইছে, উই শালার ঠাকুরটিরেও তু লুকায়্যে-ছাপায়্যে পেসাদ দিতে লেগেছিস বটে।

হাসির ধুম পড়ে যায় আবার। মুখরোচক মাদক চাট আর চাটনির আস্বাদ।

কান ঝাঁ-ঝাঁ করে ওঠে মধুময়ের। পেটের ভাত মুখ দিয়ে উগরে

বার হয়ে আসতে চায়। খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। বসে থাকে কাঠ হয়ে।

যা নিয়ে এত কাণ্ড,—হয়তো বা হৈ-চৈ তর্কাতর্কি থেকে হাতাহাতিও – তা কিন্তু আসলে আদৌ ছোটবড় নয়। তফাতের মধ্যে হয়তো পঙ্কুরানীর মাছখানায় লেগে আছে একটুকরো বাড়তি কাঁটা, কিম্বা আ-ছাঁটা গোটাকয়েক পালক। ছোটবড় হবার কথা নয়। হতে পারে না। মাছ কাটে চিন্তাঠাকুর নিজে। মাপা তার হাত। পক্ষপাতশূণ্য।

ওরা নিজেরাই তো প্রায়ই বলাবলি করেঃ হাঁ, হাত বটে চিন্তাঠাকুরের। মাছ কাট্রে, যেন মেসিনে কাট্টিছে হে।

নিত্যি লেগে থাকে একটা কেচ্ছা, কলহ আর ক্লেদমন্যতা। দুবেলা। কারণে। অকারণেও।

একদল মানুষের জানোয়ারোপম লুব্ধ হিংস্র ঈর্ষাভরা নীচতার নিদর্শন।

ঝড়ঝাপটাগুলো প্রতিক্ষেত্রেই শেষপর্যন্ত বটুকদাসকে সামলাতে হয়। এমনিতেই মুখ তার ধাপার আঁস্তাকুঁড়। তার ওপর তুবড়ি ছোটায়।

তিতিবিরক্ত হয়ে চিৎকার করে: লাও হে, বোঝ কাণ্ডটি ! আরে হেই শালারা ! হাঁ কর, তুরা। সেঁধোই আমি তুদের প্যাটে। ইটি না হল্যে তুদের শালা উই রাবুণে প্যাটের চুল্লিগুলা নিভিবে নাই বটে।

কাছে-পিঠে মধুময় থাকলে ওকে সাক্ষী-সালিশ মানে বটুকদাস।

বলেঃ ছাখো হে মাস্টার, দেখ্যে লাও ই আবাগের পুতগুলার কাণ্ডটি। ইমনটি আর দেখিছ কখনও ?

মধুময় জবাব দিতে পারে না। অমন অবস্থায় ওর বাকরোধ ঘটে।

দলের আর সব্বাইকে উদ্দেশ করে বটুকদাস বলে চলেঃ আরে

হেই শালার হাঘরেগুলা ! তুদের কি পোড়া লাজ-সরম কিছু নাই রে ? শুধা না কেনে শালারা মাষ্টার রে ! বামুনের ব্যাটা, লিখাপড়া জানা ভদ্দরলোক তো তুদের মধ্যে উই একজনাই রইছে। শুধা না কেনে আঁটকুড়ির নন্দনেরা, তুদের পারা আদেখলে জন মাষ্টার আর দেখিছে কিনা শুধা ! ইঃ, ই শালা ছারপোকার গুষ্টিরে গিলাত্যে আমি ফতুর হয়্যে যেছি হে ! তবু শালা নিখাকীর ব্যাটাগুলার প্যাট ভরিবে নাই গো ?···

মাঝে মাঝে বটুকদাস মধুময়কে একা পেয়ে বলে : জান হে মাষ্টার, ইকচ্পোড়া গানের দলের কারবার বড় ছ্যাঁচড়া ব্যবসাটি বটে।

মধুময় হয়তো জিজ্ঞাসা করে : জেনেশুনে আপনি তবে এই ব্যবসা করছেন কেন দাসমশাই ?

বটুকদাস ম্লান হেসে জবাব দেয় : মোর কথাটি ছাড়ান দাও না কেনে মাষ্টার। কিছু নাই ভূ-ভারতে। একটা কিছু না হল্যে বাঁচি কী নিয়্যে কও ? লিখাপড়াটি তো শিখি নাই যে—

থেমে যায় বটুকদাস। যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

একটু পরে কিন্তু আবার দমক দিয়ে বলে ওঠে : দিব—দিব শালার দলটি উঠায়্যে কুনদিন ! সাজের বাক্সগুলায় দিব আগুন ধরায়্যে, আর উই বাজনাবাদ্যিগুলা দিব সাঁদ করায়্যে চুল্লিতে। দেখি ই শালাদের খ্যাঁটনের কোঁদলটি টিঁকে কেমন কর্যে ? ইঃ, খ্যাটের চোটে শালারা মোরে কুনদিন নিঘ্যাৎ পাগল করিবে হে ! মের‍্যে ফেলাবে মোরে। ইতো গিলাই হাঘরেগুলারে, তবু শালার ক্ষুধা মিটিবে নাই গো ? ই শালাদের উগুলা প্যাট, না দামুদরের চড়া বটে হে ?

খাওয়ার ব্যাপারে যেখানে এমন অবস্থা, সেখানে আবার হেঁসেল থেকে চুরি।

ভাত চুরি।

যাত্রার পার্ট চোকে প্রতিরাতে দুটো নাগাদ। খাওয়ায় মেটে তিনটেয়।

খাওয়া শেষ হতে যা দেরি। যে যেখানে পারে, মাতুর-চ্যাটাই-তালাই-শতরঞ্চির ওপর শুয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয় নাকডাকা। মিহি, মোটা, গম্ভীর, বিদকুটে এক স্বর-সংঘর্ষ।

মধুময় এখানেও অবাক হয়।

সবার যেন ইচ্ছে-ঘুম। ওর নিজের চোখে অত তাড়াতাড়ি কিছুতেই ঘুম আসেনা। আসতে চায় না। রাত জেগে হট্টগোলের পরিশ্রমের পর উত্তপ্ত শরীর-মাথা ঠাণ্ডা হতেই ওর কেটে যায় বেশ কিছুক্ষণ। তাছাড়া সবার মতন যত্রতত্র ধূলোবালির ওপর মধুময় অমন নির্বিকার অসঙ্কোচে শুতেও পারে না। বাধা পায় ওর অভ্যাস আর সংস্কারের কাছ থেকে।

শুয়ে শুয়ে এপাশ-ওপাশ ছটফট করে মধুময়।

রাগ হয় ওর নিজেরই ওপর। হয়তো বা প্রচ্ছন্ন একটু হিংসাও হয় সঙ্গীদের ওপর তাদের নিদ্রা-সাধনার ত্বরিত সিদ্ধি-সৌভাগ্যে।

আর ঘুমোয় না বটুকদাস। মধুময়ের মতন বিছানায় পড়ে সে ছটফটও করে না।

দু'-বগলে দুটো "কাঁচি"-র (দিশি মদ) বোতল নিয়ে সে বার হয়ে যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন রুক্ষ মাঠে। ফেরে অনেক পরে। দু'টো বোতলই সাবাড় করে। নিত্যদিনের অভ্যাস বটুকদাসের। দু'বোতল কাঁচি তার চাইই। রোজ। সারাদিনে অন্যসময়ে সাধ্যসাধনা করলেও ছোঁবে না সে একটি ফোঁটা। বাঁধা সময় তার। বাঁধা মাপ।

গোড়ায় গোড়ায় ক'বার মধুময়ের কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিল বটুকদাস।

জানা কথা। সব্বাই জানে। তবু কেন লজ্জা পেয়েছিল বটুকদাস।

বলেছিল ঃ পোড়া অভ্যাসটি বিগড়ায়্যে গেছে হে মাস্টার। দলের মালিক হইছি তো কী হইছে? জেতে তো সিই তুমাদের জুতার সুকতলাটি বটি! এঁটো পাতাটি সগ্‌গে যাবে কী কর্যে কও?

মধুময় বলেছিল ঃ এখানে খেলেই তো পারেন।

বটুকদাস জবাব দিয়েছিল ঃ খেতাম হে, কিন্তু বিপদটি বাধাইছ যে তুমি নিজে হে মাস্টার। বামুন-ভদ্দরলোক তুমি। তুমার সুমুখে ইমন সুকর্মটিতে লাজ পাই। পাপ-পুণ্যির ডর জাগে হে মনটিতে।

সেই থেকে বটুকদাসকে আর লজ্জা দেয়নি মধুময়। বটুকদাসের সাড়া পেলেই ও ঘুমের ভান করে পড়ে থাকে। ফিরে যে সে কখন আসে মধুময় টের পায় না।

ঘুমিয়ে পড়ে ততক্ষণে।

ঘুমিয়ে পড়ে চিন্তাঠাকুর।

সারাদিন তার হাড়ভাঙা খাটুনি। রাবুণে চুল্লির সঙ্গে লড়াই। আবার সবার আগে উঠতে হয় বেচারাকে। ধরাতে হয় আবার চুল্লি। দেরি হলেই নির্ঘাৎ চুলোচুলি।

রান্নাঘরে হাঁড়িতে থাকে কিছু ভাত-তরকারি। সখীর-দলের একপাল বাচ্চা ছেলের জন্যে প্রভাতী জলপানি। ভাত না থাকলে পয়সা খরচ করে জলপানি জোগাতে হবে। তাই ঐ একখরচে দু-খরচ সামলায় বটুকদাস। ম্যানেজ করে।

খায়ও বটে ছেলেগুলো।

যত খায়, তত ক্ষিদে। কিচ্ছুতে আশ মেটেনা। চোখ মেলতে যা দেরি। খাই-খাই করে জান খেয়ে ফেলবে। বাসিমুখেই গিলবে গোগ্রাসে। ক্ষুদে রাক্কোস এক একটি।

মধুময়ের বিস্ময় দেখে বটুকদাস একদিন বলেছিল ঃ দেখিছ কী

হে মাষ্টার? উ-শালার সর্প হত্যে শিশুসর্প আরও ভয়ঙ্কর!...

সেই ভাত চুরি যায়। রোজ নয়। প্রায়ই।

চোর ধরা পড়ে না।

ধরবেই বা কে? চোর ধরার জন্যে স্বার্থত্যাগ করে ঘুম ছাড়তে কেউ রাজি নয়। হয়তো সেইটাই চোরের পক্ষে মহাসুযোগ।

চোর ধরা পড়ে না বলেই চোর হয়ে পড়ে সবাই। সবাই সন্দেহ করতে থাকে সবাইকে।

প্রকাশ্যে চোটটা কিন্তু বেশি গিয়ে পড়ে সখীর-ব্যাচ্‌টার ওপর। হয়তো তাদের সদা-ধূমায়িত ক্ষিদের জন্যে। হয়তো বা বড়দের প্রতিবাদ তারা করতে পারেনা বলেই।

বটুকদাস শাসিয়ে বলেঃ পুঁত্যে ফেলিব উই হারামজাদা বিচ্ছুরে! ধরিব যখন -জান মাস্টার—হাতে ধরিব নাই, ধরিব ঠ্যাঙে। তুলিব মাথার পরে। ব্যস্, তুম্! একটি আছাড়ে আবাগের পুতটারে নিকাশ কর্যে ফেলিব বটে—হঁা!

মনে মনে শিউরে ওঠে মধুময় সে-দৃশ্য কল্পনা করে।

কিচ্ছু বিশ্বাস নেই বটুকদাসকে। রাগলে ও সব পারে।

শেষ পর্যন্ত ধরা পড়লো চোর।

দেখা গেল, সন্দেহ তাদের মিথ্যে নয়। চোর—সখীর ব্যাচের চুনী।

চ্যাংদোলা করে সবাই মিলে ধরে নিয়ে এলো তাকে।

ভোরবেলা মাঠে গিয়েছিল ছোট-বিবেক ফকির বাখণ্ডী। সে-ই দেখতে পায়, একটা ঝোপের আড়ালে শালপাতা আর মাটির সরায় ভাত-ঝোল নিয়ে গপাগপ্ সাঁটছে চুনী।

দুই আর দুইয়ে চার মিলে যায়।

কদিন ধরে অসুখ যাচ্ছিল চুনীর। সেটা যে চুরি করে অতি-

ভোজনের প্রতিক্রিয়া, তাতে আর কারও সন্দেহ থাকে না। গতরাতে অসুখটা চুনীর বেড়েছিল বলেই তাকে ভাত দেওয়া হয়নি। তাই ভোরবেলাতেই তার ভাতচুরি।

চুনী কিন্তু পরিত্রাহি প্রতিবাদ জানাতে থাকে তারস্বরে আর এঁটো হাতমুখ নেড়ে।

বলে ঃ মিথ্যে আমারে ছুষী কোরো নাই। আমি ভাতচুরি করিব কেনে? মাঠে যেছি, নজর হলো—ভাত-ব্যন্ননের ছড়াছড়ি। তাই খেয়্যেছি ছুটো। বেশ করে্যেছি। কার কী?

কেউ কান দেয় না তার কথায়। বিশ্বাস করে না একবিন্দু।

বটুকদাস ছুটে এসে হুঙ্কার ছাড়ে ঃ চুণে! তু শালার ইমন কীর্তি র‍্যা?

ঃ ন্‌না।

চিৎকার করে প্রতিবাদ জানিয়েছিল চুনী।

ঃ না? শা-লা— !

সুরু হয়ে গিয়েছিল মার। অকথ্য নির্যাতন। বাধা দেয়নি কেউ। বরং সোল্লাসে তারা উৎসাহ দিয়েছিল বটুকদাসকে। যেন একটা মজার খেলা।

যতক্ষণ পেরেছিল, তারস্বরে চেঁচিয়েছিল চুনী। বাছা বাছা অনুপম গালাগালিতে সব্বার গুষ্টি শুদ্ধু করেছিল। কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিল।

তারপর পড়ে পড়ে শুধু গেঙিয়েছিল।

মার থামেনি তখনও। খুন চড়ে গিয়েছিল বটুকদাসের মাথায়। যেন একটা ছুর্দান্ত নররাক্ষস। ক্ষেপে গেছে। আসুরিক আক্রোশ। হাত-পা-র বিরাম থাকেনি তার।

কীল। চড়। লাথি। ধাক্কা। চুলের মুঠি।

বাধা দিতে সাহস পায়নি মধুময়। সহ্যও করতে পারেনি।

পালিয়ে গিয়েছিল দূরে একটা শালবনের মধ্যে।

গান ছিল না সেদিন রাতে। ওদের ভাষায়—"বস্তি"।

খাওয়ার পাট তাই চুকে যায় তাড়াতাড়ি। রাত দশটার মধ্যেই। কেউ কেউ শুয়ে পড়ে তারপরেই। বেশির ভাগই কিন্তু শোয়না। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বার হয়ে যায় আনন্দ-সন্ধানে। রস সংগ্রহে। সে-রস বহুবিধ। মাদকরস। জুয়ার রস। প্রেম-রস। কিনতে হয় সবই পয়সা খরচ করে। যার যেমন মর্জি। প্রকার ভেদ-সত্ত্বেও সব কটিই সমান জোরালো। সমান ঝাঁঝালো উত্তেজক।

জেগে আছে শুধু বটুকদাস আর মধুময়।

কথা নেই দুজনার কারও মুখে। সকালবেলার সেই উদ্গীরণের পর থেকেই গুম্ হয়ে গেছে বটুকদাস। ভোম্ হয়ে আছে। কথা বলেছে তখন অনেক। ভাঁড়ার বুঝিবা খালি হয়ে গেছে। তাই নিশ্চুপ।

পাশের ঘরে পড়ে আছে চুনী। মাঝে শুধু একটা দরমার ঝাঁপের ব্যবধান। থেকে থেকে গ্যাঙাচ্ছে ছেলেটা। একঘেয়ে একটানা একটা শব্দ। দুর্বহ। দুঃসহ। যেন ঘানিঘোরার শব্দের মতন। কানে গেলে ক্রমে মাথা ধরে ওঠে।

অকস্মাৎ অসহকণ্ঠে খেঁকিয়ে ওঠে বটুকদাস : ইঃ! ই হারামজাদ ছোঁড়া আজ কি আর থামবে নাই? হয়্যে গেছে সিসব তো সিই সকালে। ই শুয়ার-কা-ছানা এখুনও তবে চিল্লাইছে কেনে?

বুঝতে বাকি থাকে না মধুময়ের যে বটুকদাসের কথার সবটুকুই শুধু বিরক্তি বা অনুযোগ নয়। কিছুটা তার অনুতাপ আর অনুশোচনাও বটে।

মৃদুকণ্ঠে মধুময় বলে : অমন করে মারতে হয়?

: মারিব নাই? সাধ কর্য়ে ঠ্যাঙাই নাকি হে? পাথর তাতায়্যে তোলে যে

ঃ বাবু।

ঘরে ঢোকে চিন্তাঠাকুর।

তাকে দেখেই খিঁচিয়ে ওঠে বটুকদাস ঃ হয়েছে তুমাদের ?

ঃ আজ্ঞা। শুধু আপনার—

ঃ দরকার নাই। পাট চুকায়ে ফেল তুমরা।‘যাও। বারাও।

আর কিছু বলার সাহস পায় না চিন্তাঠাকুর। ভয়ে ভয়ে বার হয়ে যায়।

আপনমনেই গজরাতে থাকে বটুকদাস ঃ সব জনার উই একটিই বুলি। খালি খ্যাঁটন। ই শালা খ্যাঁটনের লেগেই না ইত কাণ্ডটি বটে! ঝাড়ু মারি অমন খ্যাঁটনে! যাঃ, খাব্যো নাই!

মধুময় জিজ্ঞাসা করে ঃ খাননি কেন দাসমশাই ?

ঃ সিটায় তুমার দরকার কী হে ?

ওর দিকে ফিরে আত্মবিস্মৃতের মতন খিঁচিয়ে ওঠে বটুকদাস ঃ দ্যাখ হে মাস্টার, নিজের মানটি তুমি নিজে হত্যে খুয়ায়্যো নাই। খুশি আমার, খাব্যো নাই। তুমি মুড়োলি করিছ কেনে হে ? ই কচুর দলের অধিকারিটি আমি বটে, না তুমি হে ?

চুপ করে যায় মধুময়।

দপ্ করে জ্বলে উঠে পরমুহূর্তেই আবার নিভে যায় বটুকদাস। যেন ছাই একমুঠো তাপ নেই। প্রাণও নেই।

নির্বাক কাটতে থাকে মুহূর্তগুলো। যেন মহাকাল পর্যন্ত অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে ঘরটার জমাট থম্‌থমানির ছোঁয়ায়।

ঃ মাষ্টার!

ঃ উ ?

ঃ রাগ করিছ নাকি হে ?

অনুতাপ ভিজে কণ্ঠস্বর বটুকদাসের।

ঃ না।

বটুকদাস বলে ওঠে ঃ খাই নাই কি সাধ করে মাষ্টার ? উই

হারামী ছোঁড়াটি যে এখুনও কিছু খায় নাই। কাৎরাণীটি শুনিছ নাই। যাতনায় না হে মাষ্টার, ক্ষুধায়। মান হয়েছে আবাগের পুত লাটসাহেবের। খাবো নাই। চিনি তো বটে বিচ্ছুগুলারে।

এবারও কোনও জবাব দেয় না মধুময়। বুঝতে পারে না, কিসে কী প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে।

আরও খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে বটুকদাস। তারপর হঠাৎ সে নীরবে উঠে এসে বসে পড়ে মধুময়ের পাশে। কিসের যেন একটা থরথর দ্বিধা তার মধ্যে।

ফিস্‌ফিস্‌ করে বলেঃ একটি কথা তুমারে কই মাষ্টার। ই শালাদের কুনদিন কই নাই। মানুষ না ইগুলার একটিও। শুনিবে?

: কী কথা?

: উই আবাগের পুত চুনীটার পরে আমার বিস্তর মায়া ছিল হে। মোর নিজেরও ছিল বটে একটি হারামজাদা ব্যাটা। ঠিক উই চুনীটার পারা। নামটি ছিল বটে সিটার—মাণিক।

এমন অন্তরঙ্গস্বরে বটুকদাকে এমনভাবে নিজের কথা বলতে মধুময় আর কোনদিন শোনেনি। অবাক লাগে ওর। জানা না থাকলে হয়তো ওর এমন সন্দেহও হোত যে বটুকদাস তার এতদিনের রেওয়াজ ভেঙে সেদিন সন্ধ্যেবেলাতেই নেশা চড়িয়েছে।

: কোথায় সেই ছেলে এখন? গাঁয়ে?

: না।

: তবে?

: নাই।

: নেই?

চমকে ওঠে মধুময়।

: নাই।

শূণ্যকণ্ঠে বলে চলে বটুকদাস। আকালের কালে হারামজাদী বউটি গেছে। ব্যাটাটিও। আজ মোর ই শালার দলটিতে ইত

ভাতের ফ্যালাছড়া, আর সিদিন একটি মুঠি ভাতের তরে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মেগেছি মাষ্টার। বাপ হয়্যে বাচ্চাটার মুখে দুটা দানা দিত্যে পারি নাই হে। শুখায়্যে মর্যে গেল হারামজাদা—ই দুটা পোড়া চক্ষের 'পরে—ধড়ফড়ায়্যে—চিঁ চিঁ কর্যে। ইঃ!

চোখের ওপর যেন আগের সত্যসত্য সেই সুদূর অতীতকে প্রত্যক্ষ করে শিউরে ওঠে বটুকদাস।

আজও মনে হয়—রেতে যেন মাণিক আস্যে হে মোর কাছে। ডাকে মোরে। ভাত খেত্যে চায়। ছুট্যে বারাই ঘর হত্যে। নিত্য রেতে মদ গিলি। ভুলিতে পারি নাই। ভুলিতে পারিব নাই কুনদিন।

চুপ করে বটুকদাস।

বলার মত একটা কথাও খুঁজে পায়না মধুময়। শুধু ওর চোখের সামনে থেকে যেন একটা অদৃশ্য পর্দা সরে যায়।

বুঝতে পারে,—সেদিনের সেই অসামর্থের প্রতিক্রিয়াতেই আজ বটুকদাসের দলে চলে নিত্য অমন ভুরিভোজের ঢালাও আয়োজন। স্ত্রীপুত্রকে খেতে দিতে পারেনি। দলের লোকদের তাই আকণ্ঠ খাওয়ায়। হয়তো তাদের খাওয়ার তৃপ্তিতেই বটুকদাস তার স্ত্রীপুত্রকে খাওয়ানোর একটা অবচেতন তৃপ্তি খুঁজে পায়।

আর একটা সমস্যারও প্রাঞ্জল সমাধান খুঁজে পায় মধুময়।

বুঝতে পারে, কেন অত ভাল হয় ধৃষ্টসেনের ভূমিকায় বটুকদাসের অভিনয়। অভিনয়। অভিনয় তো নয়। ও যে তার সেই বিস্মৃত অতীতকে বারবার জীবন্ত করে তোলা। মেলে ধরা সবার সামনে নিজেরই জীবনেতিহাসের একটা সবার অজানা অধ্যায়।...

ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই।

বটুকদাসও ঘরে নেই। ভাত খায়নি। তবু কাঁচির বোতল নিয়ে মাঠে ঠিকই তার হয়ে গেছে।

পাশের ঘর থেকে চুনীর গ্যাঙানি আর শোনা যায় না। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত প্রায় ভোর হয়ে এলো।

ঘুম নেই শুধু মধুময়ের চোখে।

সকাল থেকে সেদিনের প্রতিটি ঘটনা অবিরাম ঘুরপাক খাচ্ছে ওর মাথায় মধ্যে। পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কুণ্ডলী পাকাচ্ছে।

ভাত চুরি।...চুনী কে মার। ... তার কাৎরানি। ... বটুকদাসের স্বীকৃতি।...

আপ্রাণ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে মধুময়ের। ভুলতে পারছে না কিছুতেই। পেয়ে বসছে ওকে উত্তরোত্তর আরও বেশী করে। দাগ কেটে কেটে বসছে। গভীর থেকে গভীরতর হয়ে।

নাঃ বৃথা চেষ্টা। ঘুম আসবে না।

গা ঝাড়া দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে মধুময়। ঘর ছেড়ে বাইরে খোলা মাঠে বার হয়ে আসে।

শেষরাতের হিম পড়ছে। প্রায়-পূর্ণ চাঁদ ঢলে পড়েছে। তার আলোর সঙ্গে কুয়াশা মিশে দিগদিগন্তে যেন এক বিশাল ঘষা কাঁচের অস্পষ্টতা। থম্‌থম্‌ করছে। আবছা। ধোঁয়াটে। নিস্তব্ধ। নিঃসীম।

হিম জমে মধুময়ের মাথায়। ঠাণ্ডা হয়ে আসে ওর চিন্তাতপ্ত মস্তিষ্ক। স্বস্তি পায়—শান্তি নয়। পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব পড়ে ওর চেতনার ওপর। আনমনে—হয়তো নিজেরই অজান্তে কর্কশ অসম মাঠে খালি পায়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে মধুময়,—নিশি-পাওয়া এক অসহায় দিগভ্রান্তের মতন।

হঠাৎ একটা শব্দ কানে যেতেই চমকে ওঠে মধুময়।

কে যেন কাঁদছে। কাছেই।

ফিরে তাকায় মধুময়।

একটা কাঁটাঝোঁপ। শব্দটা আসছে তার ওপাশ থেকে।

সন্তর্পনে পা টিপে টিপে ঝোঁপটার ওপাশে গিয়ে দাঁড়ায় মধুময়।

আবছা কুহেলিঘন আলোয় যা ওর নজর পড়ে, তাতে মধুময় হঠাৎ যেন পাথর হয়ে যায়। বিস্ময় ওর সত্যিই সীমা ছাড়াতে চায়।

একটা মানুষ। বসে আছে ওর দিকে পিছু ফিরে। তাই হয়তো সে টের পায়নি ওর সন্তর্পণ উপস্থিতি।

লোকটার কাছেই গড়াগড়ি যাচ্ছে ছুটো শূন্যগর্ভ বোতল। আর—সবচেয়ে যা বিস্ময়কর—তার সামনে শালপাতায় রয়েছে একরাশ ভাত আর তরকারি।

মাখছে।···অঝোরে কাঁদছে।···প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রাস তুলে ধরছে সে নিজেরই মুখে।···গিলছে।··· আবার তুলছে গ্রাস।··· আবার।··· আবার।···

প্রতিবারই সে কিন্তু থরথর অশ্রুবিকৃতিকণ্ঠে বলছে : লে ! খেয়্যে নে বাপ ! খা' না কেনে মানিক ! ক্ষুধা লাগিছে রে ? বিস্তর ক্ষুধা ? আর লাগিবে নাই বাপ ! খা'-প্যাট্‌টি ভর্‌য়ে খা ! লে বাপ হ্যাঁ কর্ !

হ্যাঁ করছে সে নিজেই। খাচ্ছেও নিজে। একটা আত্মবিস্মৃত উন্মাদ। যেন একটা অবিশ্বাস্য স্বপ্নমানব। কাজগুলো তার সত্যি। তবু যেন বিস্ময়াতীত স্বপ্নাচরন। তবু পাগল সে নয়।

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মধুময় দেখে আর দেখে ।

বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। অবিশ্বাস কর্‌রারও পথ মেলে না।

বুঝতে পারে, অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে মদ বেইমানি করেনি। বিস্মৃতির জন্যে যার মদ খাওয়া, মদ তাকে সত্যিসত্যিই এমন আত্মবিস্মৃত করে তুলেছে যে সেই মদ্যপের পক্ষে নিজেকেই নিজের অনাহারী সন্তান বলে মনে করতেও বাধেনি। তাই সে একাধারে বাপ আর সন্তান দুইই হয়ে নিজেই নিজেকে পরমতম অপত্য স্নেহে আহার করিয়ে চলেছে।

অথচ নিশি শেষে নেশার শেষেরই মতন নিঃশেষ হয়ে যাবে

আবার ঐ রহস্য মানব তার সবটুকু রহস্যময়তা সমেত। পড়ে থাকবে না সামান্যতম অবশেষও।

ভোর হোল।

আবার হৈচৈ পড়ে গেল। আবার ভাত চুরি।

এবার আর চুনীকে সন্দেহ করা চলে না।

বটুকদাস যথারীতি হুঙ্কার ছাড়তে থাকে ঃ পুঁত্যে ফেলিব যিদিন ই সুমুন্দির ভাত চোরটিরে পাকড়াব্যো বটে! দিব একটি আছাড়ে সাবাড় কর্য্যে-হ্যাঁ ইত গিলাই ই মোর বারো মেসে সুমুন্দি-গুলারে, তবু ই হাঘরেগুলার ক্ষুধা মিটিবে নাই হে? জান হে মাষ্টার……

ঃ মাস্টার! শুনিছ মাস্টার?

ডাক শুনে কলম থেমে যায় মধুময়ের। মুখ তুলে তাকায়।

টের পায় মধুময় ওদের অদৃশ্য উপস্থিতি। আসে ওরা ভিড় করে। এখন শুধু এসেছে একজন।

ঃ চিনিছ না মাস্টার? মনে পড়িছে না আমারে?

চিনবে না কী? ওর কথা কি ভোলা যায়? ও যে অনন্য। ঐ হাসি। ঐ অফুরান প্রাণপ্রাচুর্য। ও কি সেই একজন ছাড়া আর কারো মধ্যে সম্ভব?

কিন্তু কী চায় ও? ওতো কোনদিন কারো কাছে কিচ্ছু চায়নি।

ঃ আমার কথাটি লিখিবে নাই মাস্টার?

আশ্চর্য! সবার ওদের একই অনুরোধ। সবাই ওরা ভিড় করে হুড়োহুড়ি করে মধুময়কে ঘিরে ধরে ঐ একই তাগাদা করে।

শুধু ওরা কেন? এ-অনুরোধ চেনা-জানার মধ্যে কে করেনি মধুময়কে?

এই চাওয়াই কি সব মানুষের চিরদিনের অতৃপ্ত চাওয়া?…

মজঃফরপুরের তাপ্তি ভাদুড়ি, দেওঘরের সেই রাজকুমারী শুক্লা,

নিওলাইট কোলিয়ারীর দুর্ধর্ষ্য ঠিকাদার গঙ্গাবিষ্ণুণ ভারতী, বালীগঞ্জের অসন্ধিমিত্রা চৌধুরী, ওয়েলশলীর মার্থা রোজ, নিমতলা-ঘাটের মড়িপোড়া বামুণ শ্রীনাথ আচার্যি, সোনাগাছির মক্ষীরাণী ময়না আর বিগতযৌবনা ফিরোজা,—সব্বাই বারে বারে জানিয়েছে ওকে ঐ একই অনুরোধ।

অচেনা কতজন দূর-দূরান্ত থেকে আজও মিনতিভরা চিঠিতে মধুময়কে নিত্য জানায় ঐ একই আকুতি।

সারাটা জীবন ওরা বেঁচে থেকেও তিলে তিলে মরে, কেউ বা আধমরা হয়ে বাঁচে, কেউ বাঁচে জীবন্মৃত হয়ে। তাই বোধহয় মরার পরও পুঁথির পাতায় আর অসংখ্য পাঠকের মনে মনে অমর হয়ে থাকার ওদের এই ব্যাকুল আগ্রহ। সবারই ধারণা—তার দুঃখ, তার ট্র্যাজেডিই বোধহয় সবার সেরা।

মনে পড়ে মধুময়ের দক্ষিণীকন্যা সুভদ্রামালিনীর কথা।

সুভদ্রা বলেছিল: মধু, য়্যু আর স্ট্রেনজ। ফিল্মষ্টার সুভদ্রা-মালিনীর একটু হাসির জন্যে কতো নও-জোয়ান ঝাঁপ দিতে পারে কুতুবের চূড়ো থেকে। আর এতো করে বলছি তোমাকে, তবু তুমি আমাকে নিয়ে কিছু লিখছো না? এত পেয়েও কেন না-পাওয়ার ব্যথায় কাঁদি বলতো?

মধুময় বলেছিল: মলি, তুমি কেবলি ছবি। পার যদি আগে তুমি বিজ্ঞাপনের পাতা আর ছায়াছবির পর্দা থেকে মাটিতে নেমে এসো। আর কিছু না হোক, প্রাণভরে নিশ্বাস নিতে পারবে অন্ততঃ।

নিভে গিয়েছিল দক্ষিণী তারকার সব দ্যুতি।

লজ্জায়—অপমানে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে গরবিনী তারকা থরথর কণ্ঠে ওকে মিনতি জানিয়েছিল: দেশে-বিদেশে কমপক্ষে হাজারবার নানান রঙের বাহারে কালিতে আর ছবিতে ছাপা হয়েছে মুভি-ষ্টার সুভদ্রা-মালিনীর লাইফ। তার একটাও কিন্তু আমার ইতিহাস নয়।

দক্ষিণী গাঁয়ের একটি গ্রাম্য বালা। সুভদ্রাকে তুমি দেখেছ মধু, জান তুমি তার ট্র্যাজেডী আর ব্যর্থতার ইতিহাস। তার কথা তুমি লিখো মধু! না হয় কালো কালিতেই লিখো। লিখো কিন্তু।...

লেখা হয়নি আজো সুভদ্রামালিনীর ইতিহাস।

লিখতো মধুময়। কিন্তু সুভদ্রামালিনী যে ন'বছর বাদে সেবার আবার হঠাৎ—

কিন্তু সে কথা এখন থাক। সেটা আর এক প্রসঙ্গ। আর এক ইতিহাস।

ঃ মাস্টার! কী ভাবিছ হে?

আবার ডাক দিল প্রাণময় কালো ছেলেটী।

ঃ লিখিবে নাই আমার কথাটি?

ঃ কিন্তু কেন? তুমি তো নাম চাওনি টন্‌শা, চাওনি কোনদিন কোনকিছু। আজ কেন তবে—

ঃ নিজের নামটি চাই নাই মাস্টার। শুধু চাইছি, তুমার সাথে নিজের নামটি জড়ায়্যে রাখিতে।

ঃ কেন?

ঃ লোকে জানিবে, টন্‌শা শুধু যাত্রাওয়ালা ইতরজনাই ছিল নাই। তুমার মতন ভদ্দরজনের ভালবাসাও সে পাইছে বটে। তুমি জান নাই মাস্টার, মেডেল-যশ অনেক পেয়্যেছি ই পোড়া-জীবনে। সেগুলা কিছু না। ভূয়া। আমার ই হতভাগা জীবনে সেরা মেডেল হইছে তুমার ভালোবাসা। তাই কই—

আর কথা বলতে পারে না টন্‌শা। লজ্জায় মূক হয়ে চোখ নামায়।

মধুময়ও এরপর আর পারে না তাকে নিরাশ করতে। কথা দেয়।

নিঃশব্দে বিদায় নেয় টন্‌শা।

একা ঘরে অনড় কলম নিয়ে বসে থাকে মধুময়। লিখতে হবে। কথা দিয়েছে টন্‌শাকে।

কিন্তু কোথা থেকে সুরু করবে ?

ক্ষণগুলো উড়ে চলে মুক্তবলাকার মতন উধাও পাখা মেলে !

মধুময়ের মনও উধাও পাড়ি দেয় সেই ফেলে-আসা দিনগুলোর নাগালে।···

ওরা বল্‌তো—টন্‌শা।

বুঝতে পারতো না মধুময় ও-কথার মানেটা। বুঝতে অবিশ্যি ও তখনও ওদের অনেক কিছুই পারতো না। প্রথম প্রথম তো মধুময় নাজেহালও হোত যত, অবাকও হোত তত !

ও কী করে জানবে বলো যে এদের পরিভাষায় "নায়েক" হোল বায়নাদার, "সাইভ্" মানে আনন্দোৎসব, "নম্বর" অর্থে অভিনেয় সংলাপ, "কেরাসিন্" হোল অভিনয় ও সংলাপ হ্রস্ব করার সাঙ্কেতিক মন্ত্র ?

তাই "টন্‌শা" কথাটার মানেও মধুময় জানতো না।

শুনতো অবিশ্যি অনেকের মুখে যে ওদের দলে "টন্‌শা" একটাও নেই, এবং এহেন প্রত্যেক দলে একটা করে টন্‌শার দরকার নাকি অপরিহার্য।

সেই "টন্‌শা" এলো দলে।

মধুময় আরো অবাক হোল। কথাটার মানে হয়ে উঠলো তার কাছে আরো দুর্বোধ্য।

···"টনশা"ও তাহলে মানুষ ?

অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখলো মধুময়।

নাতিদীর্ঘ মানুষটা। বড়জোর পাঁচফুট এক ইঞ্চি। কালো। তেল-কালো। যেন পালিশ-করা ত্বকশ্রী। বছর বাইশ বয়েস। এক-মাথা ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া অতি-কুঞ্চিত চুল সযত্ন-বিন্যস্ত। স্বাস্থ্য উপচে পড়ছে। আর উপচে পড়ছে দুচোখ দিয়ে অজস্র খুশির আমেজ।

যেন নালিশ নেই ছনিয়ার কোন কিছুর বিরুদ্ধে। ছঃখ নেই কোন কিছুতে। শুধু আনন্দ আর খুশি।

নাম—ন্যাপ্‌লা। বোধহয়, নেপাল-এর আটপৌরে সংস্করণ।

এই তাহলে টন্‌শা ?···কিন্তু কী কাজ এর ?· যাত্রাদলে কীসের এত গুরুত্ব এই টন্‌শার।

কৌতুহল চাপতে না পেরে কথাটা এক ফাঁকে জিজ্ঞাসা করে ফেলেছিল বটুকদাসকে।

শুনে একগাল হেসে বটুকদাস জবাব দিয়েছিল : হাই ছাখ! শুধাইছ কী হে মাস্টার ? গানের দলে রইছ ইতদিন, আর টন্‌শা জান নাই ?

এমনভাবে বটুকদাস তাকিয়েছিল মধুময়ের দিকে যেন নেহাৎই সে একটা অপোগণ্ড অবোধ।

লজ্জা পেয়ে মধুময় বলেছিল : জানলে আর তোমাকে জিজ্ঞেস করবো কেন ? বলোনা, কী করবে ও ?

: আহা, কী করিবে নাই উই মোর গুরুঠাকুর টন্‌শাটি, সিটাই কেনে শুধাও না হে ? আরে, টন্‌শা হইছে গানের দলে বিশ্বকর্মা। যাক না কেনে ছটা দিন, নিজচক্ষেই দেখ্যে নিও—হুঁ। ।···

দেখে নিয়েছিল মধুময়।

দিনের পর দিন দেখেছিল। দেখেছিল প্রতিরাতের অভিনয় আসরে। যতই দেখেছিল, ততই অবাক হয়েছিল। মুগ্ধও। মনে-প্রাণে স্বীকার করতে হয়েছিল মধুময়কে বটুকদাসের কথাটা।

হাঁ, সত্যিই বিশ্বকর্মা লোক ঐ টন্‌শা ন্যাপলা। ওর অসাধ্য কর্ম কিছু নেই। সব পারে। অনায়াসে।

মধুময়ের শোনা ছিল, য়্যুরোপ-আমেরিকার প্রখ্যাত মঞ্চশিল্পীদের বিশেষ বিশেষ ভূমিকায় "আণ্ডার-স্ট্যাডি" থাকে। মূল শিল্পীর আপদ-বিপদ অনুপস্থিতে কাজ চালিয়ে দেয় সেইসব "আণ্ডার-স্ট্যাডি"-রা।

টন্‌শা ন্যাপলাও তাই। তবে সে বিশেষ কোনও চরিত্র বা শিল্পীর বদলি নয়। সব্বার। সব নাটকে। সব পার্টে।

নিত্য রাতে অভিনয়। অসময়ে নাওয়া, খাওয়া, শোওয়া। তার ওপর পথের কষ্ট। তাই চল্লিশটা লোকের মধ্যে প্রায়ই কারো না কারো অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকে। আগে আগে এ-অবস্থায় অধিকারী বটুকদাসের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়তো। মাত্র একজনের জন্যে তো আর গান বন্ধ থাকতে পারে না! অথচ সেই একজনের কাজ অন্য কাউকে দিয়ে চালিয়ে নিতে বটুকদাসের প্রাণান্ত হোত। খরচও হোত বাড়তি। ঠেকা-পার্ট কাউকে দিয়ে করাতে হলে বাড়তি দক্ষিণা দিতে হয়।

এখন আর সে ভাবনা নেই।

টন্‌শা ন্যাপলা আছে। একবার শুধু বললেই হোল।

কী পার্ট?

তয়বর খাঁ? সমরসিংহ?··ভরত?· তরণীসেন?···দুর্বাসা?··· বিদূষক?···বিবেক?···উর্মিলা?···উর্বসী?···পদ্মিনী?···

কুছ্‌ পরোয়া নেই। হাজির আছে টন্‌শা ন্যাপলা।

বই পড়া নেই, পার্ট জানা নেই,—তাতে কী?

দুটো কথায় শুধু বলে দাও চরিত্রটা কী?···রাজা?···যুবরাজ? ··হিঁন্দু, না মোছলমান?···কতো বয়েস?···ডার্ক রোল, না সুইট্‌?···

জানিয়ে দাও—কী নম্বর বলে প্রবেশ, আর কি বলে প্রস্থান? আর গানের মধ্যে বিশেষ কোনও "কারদানি" বা বিজনেস্‌ আছে কিনা?

ব্যস্‌, আর কিচ্ছু দরকার নেই।

মেক্‌-আপ্‌ বাক্স খুলে রঙ মাখতে বসে গেছে টন্‌শা। আশ্চর্য ক্ষিপ্রতা তার। আর সবার হয়তো চারশো রাতের অভিনয় করা পার্ট। ন্যাপলাই নতুন। তবু দেখা যাবে, সবার আগে সে-ই সাজ-

গোজ সেরে নির্বিকার ভাবে বিড়ি টানছে।

ক্ষমতাও বিস্ময়কর। অনুপম সহজাত প্রতিভা। আজ রয়েল-ড্রেস পরে রাজা সাজছে। কাল আবার শাড়ি পরে রানী। তার পরদিন মাথায় পাগড়ি বেঁধে বিবেক সেজে খানকুড়ি গানে আসর মাৎ করে দেবে। দরকার হলে তার পবদিন আবার ইয়া জটা আর দাড়ি এঁটে তুর্বাসা হয়ে পৈতে ছিঁড়ে অভিশাপ দিয়ে আসর চমকে দেবে সমান সাবলীল কৃতিত্বে।

অথচ বে-আইনি কিছু করবে না।

বাঃ। আইন নেই ?

পেশাদার যাত্রাদলে আছে শতশত অলিখিত চিরাচরিত আইন।

"কিউ" "ক্যাচ্-ওয়ার্ড" বা ওদের ভাষায় "ধরতাই" কেউ কাউকে বলে দেবে না। নিজেকে তৈরি থাকতে হবে। "ফেল্" করলেই সর্ব্বনাশ। লাঞ্ছনা অপমানের সীমা থাকবে না। তা হও না কেন তুমি নতুন বা পুরানো লোক। একের জন্যে দশের যশে "খাম্তি" হবে কেনে হে ?

সীনে বার হয়ে মানে বজায় রেখে নম্বর তুমি যা খুশি বলো, তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু কো-এ্যাক্টরেব নম্বর আরম্ভ হবে যে-ধরতাই-এর পর, তা তোমাকে ঠিক মিলিয়ে দিতেই হবে। নইলে খ্যাতির তো নেই-ই, উল্টে ধরতাই না পাওয়ার দরুন কো-এ্যাক্টর যদি সীনে আর কথা না বলে, কিম্বা মাঝ পথে মৌনী নিয়ে সীন্ থেকে গট্‌গটিয়ে বার হয়ে যায়, তাহলে সে-দোষ তোমারই। "সাটে" (পাণ্ডুলিপিতে) যদি লেখা থাকে যে তোমাকে একটা নম্বর শেষ করতে হবে "ভগবান তোমার মঙ্গল করুন" বলে, আর তারপরেই সুরু হবে কো-এ্যাক্টরের নম্বর, তাহলে তুমি কক্ষনো বলতে পাবে না "ভগবান তোমার ভাল করুন"। সেটা হবে "ফাউল" করা। মহা অপরাধ।

সাজঘরে বই থাকবে না। থাকবে না একখানাও প্রোগ্রাম।

কেউ কাউকে ডেকে দেবে না "প্রবেশ"-এর সময়ে। কান খাড়া রাখতে হবে তোমায় নিজেকেই।

সীন-এ প্রম্পট্ হবে নতুন পালা খোলার পর মাত্র দশরাত। তাও পুরোপুরি নয়, প্রম্পটারের মর্জি-মাফিক। দশরাতের পর ও-পাট বন্ধ। কেননা, প্রম্পটের শব্দ কানে গেলেই নায়েকরা মহা হুজ্জৎ করবে, এমন কি "বিদেয়"-এর (পাওনাচুক্তি) সময়ে "সইত" বা বখশিষের বদলে "ঘাটা করে দেবে" (কেটে নেবে) একমুঠো টাকা। তবু যদি প্রম্পট হয়ই, তা হবে নায়েকের কান বাঁচিয়ে আর প্রম্পটারের খেয়াল-খুশিমত নেহাৎই অকিঞ্চিৎকরভাবে। বিশেষ সাহায্য যদি চাও, চুপি চুপি ঘুষ দিয়ে রাখো তাহলে প্রম্পটারকে। দুকাপ চা ছাড়তে হবে, আর এক প্যাকেট কাঁচি সিগ্রেট্। নইলে দেখবে তুমি সীনে ঢুকলেই প্রম্পটার আসর ছেড়ে গুটিগুটি উধাও হচ্ছে চটিজোড়ায় বাঁ হাতের দুটো আঙুল গলিয়ে উঁচুতে তুলে।

কো-এ্যাক্টরের বাঁধা "ঘাট" (হাততালির সুযোগ) তোমাকে বাঁচিয়ে ছেড়ে দিতেই হবে। কোন হক নেই তোমার কারো যশ "ছেনতাই" (কেড়ে নেওয়া) করার। সে-ও তাহলে ফাউল করবে। যাচ্ছেতাই অপমান করবে।

টনশা ন্যাপলাকে কিন্তু কোনদিন কোন আইনের খেলাপ করতে দেখেনি মধুময়। শোনেনি তার নামে কোনও এ্যাক্টরের কাছে কোনও নালিশ। তার সাহস দেখে বারবার ভয়ে শিউরে উঠেছে মধুময়। মাত্র পাঁচমিনিটের নোটিশে যে কোনও অজানা নতুন পার্ট-এ নেমে পড়েছে ন্যাপলা। মারের ভয় পর্যন্ত নেই। সমান সাবলীলে সবার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অভিনয় করে গেছে ন্যাপলা। কাজ চলোনো অভিনয় নয়। রীতিমত হাততালি আর মেডেলও আদায় করেছে।

অথচ বিনয়ের অবতার।

সীনে যাবার আগে অতি সকাতরে সবাইকে আকুতি জানিয়ে বলবে—চালায়ে নিও ভাই। দোষ ভুলগুলা ক্ষমা কর্যে নিও !

নিছক বিনয় ওটা। কারো সাহায্যের দরকার ওর হয়না। বরঞ্চ সীন-এ নতুন আর আনাড়ি কেউ থাকলে, ও নিজেই তাকে যেন ডানা মেলে আগলে রাখে।

বারবার অবাক হয়েছে মধুময়। অনেকে ভেবেছে। তবু ভেবে পায়নি, কী করে এমন অসাধ্যসাধন করতে পারে ঐ নিরক্ষর টনশা ন্যাপলা।

একদিন জিজ্ঞাসাও করে ফেলেছিল।

ঝাঁ করে মধুময়ের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে ন্যাপলা হেসে জবাব দিয়েছিল—ভয় করিব কেনে মাষ্টার? ইসবই বটে উই ছিচরণের আশীর্বাদ। তুমাদের উই চরণ-মহিমায় উ শালার যমরাজাকে ডরাই নাইহে, তা ইতো ভা-রী যাত্রাগান! কী জান মাষ্টার? জন্মের কালে আর কিছু পাই নাই হে উই আকাশের দেবতাগুলার ঠেঙে। ধন নাই, রূপ নাই বিদ্যা নাই, সহায় নাই, সম্বল নাই। দয়া করে দিছে শুধু—এইটুকু। আশীর্বাদ করো মাস্টার, ই-ধন যেন আমার অক্ষয় হয়।

কথাশেষে আবার সে একখাবলা পায়ে ধুলো মাথায় তুলে নিয়েছিল।...

আর একটা ব্যাপারও সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলো মধুময়।

যে-রাতেই টন্‌শাকে সাজতে হয়, সাজঘরে সে আগে গলায় ঢালে আস্ত একপাঁট "কাঁচি" (চোলাই মদ)। আর সে-বোতল জোগান দেয় অধিকারী বটুকদাস।...

শুধু কি যাত্রার পার্ট? কীসে নেই টন্‌শা?

আসর ছেড়ে হারমোনিয়ম-বাজিয়ের একটু বাইরে যাওয়া দরকার। টনশার হয়ত পার্ট নেই সে-পালায়। আসরে বসে গান শুনছিল। টেনে নিল টন্‌শা হারমোনিয়ামটা। তবলচির

অসুখ। বহুতাচ্ছা, পরমোৎসাহে তবলাসঙ্গত সুরু করে দিল টন্‌শা। কিছু না পেলে নিদেন মন্দিরে জোড়া হাতে নিয়েও টন্‌শা টুনটুন করে তাল দেবে।

দিন দুই বামুণ-ঠাকুরের অসুখ করেছিল।

বটুকদাস-সমেত গোটা দলটার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল।

দুবেলায় আশীজনের খোরাক সেদ্ধ করা আর চল্লিশজন ক্ষুদে নবাবের তম্বি মুখ বুজে সহ্য করা চাট্টিখানি কথা নয়। ঠাকুর হয়ত দিনকয়েকের জন্যে ধরে একটা নেওয়া যেত। তার রান্না কিন্তু কেমন হবে, তা কে জানে? খেতে বসে দলশুদ্ধু হয়তো খাওয়া ফেলে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে পড়বে। তাহলেই ব্যস্, চল্লিশজনে মিলে অধিকারীর হাড়মাস চিবিয়ে খাবে। হয়তো গান পর্যন্ত করবে না জোট পাকিয়ে। বিদেশ "খেপ"-এ (ব্যবসায়ী সফর) বার হয়ে লাভ চুলোয় যাক, দলই উঠে যাবে বটুকদাসের।

সকাল থেকে সখীর ব্যাচ্‌কে নতুন একটা নাচ মকসো করাচ্ছিল টনশা। কথাটা তার কানে গিয়ে পৌঁছল একটু দেরিতে। সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে এলো।

বললো: ইরি তরে ইত ভাবনা করিছ বটে দাস মশাই? আরে, আমি তালে রইছি কেনে?

: পারিবে?—অসহায় বটুকদাস নিদারুণ সন্দেহভরে জানতে চেয়েছিল।

হাত পা নেড়ে যাত্রার ঢংয়ে জবাব দিয়েছিল টন্‌শা:—

তব আশীর্বাদে উত্তরিতে পারি আমি
উত্তাল সাগর, গিরিরাজে উলঙ্ঘিতে পারি।
নভ হতে চন্দ্রসূর্যে পারি ছিনিবারে।
পারিব না রন্ধন সারিতে? পারি কিম্বা হারি
তাহা দেখ পরখিয়া। দেহ অনুমতি শুধু।

অনুমতি দিতে বাধ্য হয়েছিল বটুকদাস।

তিনটে দিন—ছ'টা বেলায় প্রমাণ করে দিয়েছিল টন্‌শা তার হাতযশ। ধন্যি-ধন্যি পড়ে গিয়েছিল তার রান্নার।···

এ-ছাড়া আরও আছে।

কারও অসুখ যদি করেছে তো বুক দিয়ে আগলে পড়বে টন্‌শা। ছোটবড় বাছ-বিচার নেই। নাওয়া-খাওয়া ভুলে মায়ের মতন যত্নে-আদরে সেবা করবে তার।

হাসিমুখে ফাই-ফরমাস খাটবে চল্লিশজনের! বিরক্তি নেই আপত্তি নেই।

সুযোগ পেয়ে ঝানু ব্যবসাদার বটুকদাসই তাকে সবচেয়ে বেশি খাটাতো।

কাছে-পিঠে হাটবাজার নেই। যেতে হবে মাঠ ভেঙে তিনকোশ দূরে। যাক টন্‌শা। যায়। ফিরে আসে প্রকাণ্ড একবস্তা বাজার কাঁধে করে গলদঘর্ম হয়ে। চল্লিশজনের বাজার। ইচ্ছে করলে অনায়াসে আড়াইটে টাকা গোঁজামিল দিতে পারতো টন্‌শা। অথচ টন্‌শা বাজার দরের চেয়ে সস্তায় গস্ত করে দুটো টাকা বাঁচিয়ে দিয়েছে বটুকদাসের।

দলের অনেকে সুযোগের এহেন অপব্যবহারে আপশোষে ছট্‌ফট করতো।

ওকে আড়ালে ডেকে বলতো ঃ আহা রে, ইমন দাঁওটি তু ছেড়ো দিচ্ছিস টন্‌শা? তু শালা আস্ত একটি গাধা। উন্নতি নাই বটে তুর বরাতে।

টন্‌শা হেসে জবাব দিত ঃ আর উন্নতি ঘটিলে মেজাজটি হয়তো ঠিক রাখিতে পারিব নাই হে! যা হইছে, সিটাই আমার বিস্তর বটে।···

এত যে গুণের টন্‌শা, এত যাকে বিনি-পয়সায় বেগার খাটিয়ে

নিত বটুকদাস, মাইনেটা কিন্তু ছিল তার নেহাৎই সামান্য। দলের আর পাঁচজনকেই মধুময় বহুবার বলাবলি করতে শুনেছে যে অমন একটা চৌকশ টনশাকে অন্য যে কোনও দল পাঁচগুণ মাইনে দিয়েও গুণে নিতে পারে।

টন্‌শা কিন্তু ওতেই সন্তুষ্ট।

মধুময় একদিন আড়ালে বলেছিল ওকে সেকথা।

হেসে জবাব দিয়েছিল টন শা: বিস্তর ট্যাকায় আমার দরকারটি কী মাস্টার? দুবেলার ভাত তো দলই দিছে। নিত্যি রাত তো দলের পোষাক পর‍্যেই দিব্যি কাটিছে। একটি পিরাণ আর একটি ধুত হল্যেই বছর কাবার। আর প্রয়োজন একটি বোতল। সিটাও তো জোগাইছে অধিকারী। তবে? অসুখ? তুমাদের উই চরণকৃপায় জ্বর-জ্বারি আমার আজ অবধি হয় নাই। মাগ নাই, মেয়্যে নাই। কী করিব কও তো আরো মুঠামুঠা ট্যাকা নিয়্যে?

টন্‌শার শেষ কথাটা অবশ্যি নেহাৎই বাজে কথা। টাকা খরচ করার রাস্তা ওর অনেক আছে। করেও খরচ বেদরদে।

মধুময় দেখে আর ভাবে!

···এ কোন সৃষ্টিছাড়া এলো গানের দলে? এমন বোকাও হয় নাকি?

চল্লিশজনার দল। অন্যসময়ে সবাই যেন একেবারে হরিহর-আত্মা।

কিন্তু ঐ পর্যন্ত।

খরচের সময় আসুক। ব্যস্, কেউ কারো নয়।

দোকানে চা খেতে গেল চারজনে একসঙ্গে। অর্ডার দিল একজন। একসঙ্গে চারজনেই একই টেবিলে খেলো চা-বিস্কুট। দাম নিতে আসুক দোকানদার। অর্ডার-দাতার তখন আর খেয়াল থাকবে না যে চারজনের অর্ডারটা সে-ই দিয়েছিল। নির্বিকারে সে বার করে দেবে শুধু নিজের ভাগের দামটুকু। আর তিনজনও তাই করবে।

চক্ষু লজ্জাটাকে ওরা বিসর্জন দিয়ে তবে বোধহয় দলে নাম লেখায়।

একটা বিড়ি কেউ কাউকে খয়রাত করবে না। পকেট-ভর্তি বিড়ি। মুখে সাফ শুনিয়ে দেবে : নাই হে।

খাবার ঘরে নিত্যি দুবেলা তুলক্লাম কাণ্ড।

ললিতার মাছটা বড় কেন ?

বেন্দাকে চারখানা আলুভাজা কেন ?

মদনার বেলায় আওট পাতা, আর খগনার পাতায় ডাল গড়িয়ে যাবে ?

কেনে হে ? উ শালারা পীর হইছে ? অধিকারীর বোনাই-কুটুম বটে ?···

দেখে শুনে মধুময়ের ইচ্ছা হোত সব ছেড়ে ছুটে পালায় ওদের সংস্পর্শ থেকে।

এমনি যেখানকার রীতি আর আচার, টন্‌শা ন্যাপলা সেখানে দেখা দিল মূর্তিমান বিদ্রোহী কালাপাহাড় হয়ে।

দু'হাতে টাকা ওড়ায়। নিজের খরচে মদ গেলায় গোটা দলকে। চায়ের দোকানে আগ বাড়িয়ে টন্‌শাই সবার হয়ে খরচ করবে। নিজের টাকায় মুর্গি আনাবে টন্‌শা। নিজে রেঁধে সবাইকে ডেকে ডেকে খাওয়াবে। নিজের ভাগে শেষ অব্দি কিছু না রইল তো বয়েই গেল। কোথাও কিচ্ছু নেই, কিনে বসলো হঠাৎ আধমনটাক দুধ, কিম্বা কমলালেবু দু'টুকরি। খাও সব যত পারো— !

খেতোও সবাই। মেজাজ বুঝে অনেকে আবার উস্কে দিয়েও খরচ করাতো। কাছে থাকলে, "না" বলতো না টন্‌শা কাউকে কোনদিন।

দিত সব্বাইকে, কিন্তু চাইতো না সে কারো কাছে কোনও কিছু। হাতপাতা তার কুষ্ঠিতে লেখেনি। মরে গেলেও না।

মধুময় দেখতো আর অবাক হোত। অবাক হোত সে টন্‌শার

স্বার্থশূন্যতায়, বদান্যতায়, উদারতায়।

আর অবাক হোত সে টনশার অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্যে।

হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করতো টনশাঃ কী দেখিছ হে মাস্টার? কিছু বলিবে?

মুগ্ধ মধুময় বলতোঃ এমনি মন আর এমনি প্রাণপ্রাচুর্য তোমার অটুট হোক টন শা!

ধাঁ করে ঝুঁকে পড়ে টনশা একখাবলা পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দিত।...

মাত্র চারমাস।

তারপরেই চাকরি গেল টনশার।...

মাসখানেক ধরে একটা নতুন উপসর্গ দেখা যাচ্ছিল টনশার। অমন চৌকশ লোকেরও মাঝে মাঝে পার্টে খামতি হচ্ছিল। ঠিক যেন আসর জমাতে পারতো না সবদিন।

মধুময় অবাক হোত। বটুকদাস বকাবকি করতো।

বলতোঃ ব্যস্, হয়্যে গেছে শালা টনশার কেরামতি! ই সুমুন্দিগুলার স্বভাবই বটে ইমনধারা। ঠগের গুড়ের নাগরি এক একটি। উপরে একছিটা উত্তম, তার তলেই ছাইপাঁশ। ভাবিছ যে চাকরিটি পাকাপোক্ত হইছে, ব্যস্, আর খাটিব কেনে? চিন নাই তো আমাকে? দিব একদিন পাছায় লাথি মের‍্যে তাড়ায়্যে, বুঝিবে সিদিন—হঁা!

টনশা শুনে কখনও শুধু হাসতো। কখনও গুম্ হয়ে বসে থাকতো।...

সেদিন কিন্তু পার্ট করলো অতি যাচ্ছে-তাই।

গাঁয়ের নাম—মৌপুর। রাঢ় দেশ। চারদিনের বায়না নিয়ে ওরা

প্রথম এসেছে। দালাল বলেছে, গান ভাল হলে এ অঞ্চলের অন্যান্য গাঁয়ে এত বায়না পাওয়া যাবে, যাতে চার মাস কারবার করা যাবে বেশ ভালভাবে।

অথচ প্রথম রাতেই এমন গান হোল যে ছিছিকার পড়ে গেল। পরের বায়না তো দূরের কথা, মৌপুরের বায়নাই বুঝিবা কেঁচে যায়।

দোষটা প্রধানতঃ টন্‌শারই।

মারমুখো হয়ে তেড়ে এলো বটুকদাস। মুখে ছুটলো তার অনর্গল কটুকথা আর খিস্তির ঝড় বন্যা।

অনেকক্ষণ মুখ বুজে গুম্ হয়ে বসে রইল টন্‌শা। তারপর— দলশুদ্ধু সবাই সেই প্রথম দেখলো অবাক হয়ে—টন্‌শাও জ্বলে উঠলো দপ্ করে।

বললোঃ চক্ষু দুটি রাঙা কারছ কেনে হে অধিকারী। পার্ট খাম্‌তি হইছে, অপরাধ হইছে, মানছি। কিন্তু তুমি কেনে অধর্মটি কারছ কও তো ?

ঃ অধর্ম !—ক্ষেপে উঠলো বটুকদাসঃ ক' না কেনে শালা ধর্মপুত্তুর, কি অধর্মটি করিছে বটুকদাস ?

ঃ তুমি জান নাই ? মনের অগোচরে পাপ নাই হে অধিকারী ! আবার শুধাইছ ? কই ইত জনার মাঝে তুমার গুণের কথাটি ?

ঃ ক' না কেনে হারামজাদা, ক'।

ঃ তুমি কেনে মোর মালের বরাদ্দে ভেঁজাল দিছ হে ? কেনে থেক্যে থেক্যে জল মিশাইছ মোর বোতলে ?

একটা বাজ পড়লো যেন ঘরে।

থ' হয়ে গেল সব্বাই। কটা মিনিট বটুকদাসেরও মুখে কথা ফুটলো না।

টন্‌শা আবার বলে উঠলোঃ মোর সাথে তুমার বায়নার সর্তটি ভুলিছ কেনে হে ধর্মরাজ অধিকারী, সিটা কও দিকি ? তুমি খেলাপ

করিছ সর্তের, আমারও খাম্‌তি হইছে পার্টের—ব্যস্‌। আবার কথা কী ?

ধেই-ধেই করে নেচে উঠলো বটুকদাস।

ঃ কী ? ইত বড় আস্পর্ধা হইছে তুর ? বেইমান কইছিস আমারে ?

ঃ কইছিই তো ! বুকে হাতটি রেখ্যে কও দিকি অধিকারী, বেইমানি তুমি করিছ নাই ? দিছ নাই মালে ভেজাল ?

ঃ হাঁ, দিছি, দিছিই তো ! বেশ কর্যেছি !—গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বটুকদাসঃ দরকার নাই ইমন নেশাড়ী টন্‌শায়। যাও, বারাও !

"বারাও" তো বারাও।

মিনিট দশেকের মধ্যে বিছানা বেঁধে, স্যুটকেশ গুছিয়ে, পাওনা-কড়ি মিটিয়ে, সবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে দল ছেড়ে বার হয়ে গেল টন্‌শা। কেউ একটা কথাও বললো না বটুকদাসকে টন্‌শার হয়ে।

মধুময় শুধু বলতে চেয়েছিলঃ মদ একটু কম হলে কী এমন হয় টন্‌শা যে—।

হেসে জবাব দিয়েছিল টন্‌শাঃ হয় হে মাস্টার, হয় ! ছোটকালে মায়ের দুধ, আর বড় হয়্যে মদ। একটু কম হইছে খোকার কাঁদন থামিবে নাই, বুড়া খোকার মৌতাত জমিবে নাই। স্বভাবটি মোদের ইমনই বদ হয়্যে গেছে বটে।

পায়ের ধুলো নিয়ে চলে যায় টন্‌শা।···

মাঝে গেল দুটো মাস।

গিয়েছিল মৌপুরে। ফিরে এলো দারকেশ্বরে।

দলের হাল তখন শোচনীয়। ছোট যুবরাজ সাজে যে হরিপদ, মাতাল হয়ে পা মচকে সে পড়ে আছে দিনপাঁচেক। "বস্‌তি" যাচ্ছে দলের। আরও দিনপাঁচেকের মধ্যে যে খাড়া হবে হরিপদ, সে-

ভরসাও কম। ছোট হোক, তবু আস্ত একটা যুবরাজকে বাদ দিয়ে গান হয় কখনো ?

তাই গান বন্ধ। নায়েকরাও আর সবুর করতে রাজি নয়। যায় বুঝিবা সব বায়না কেঁচে।

দুদিক দিয়ে লোকসান বটুকদাসের। গান নেই, তাই আয়ও নেই। ওদিকে দুবেলায় আশীজনের রাবুণে খোরাক তাকে ঠিকই জোগাতে হচ্ছে। মেজাজ তাই তার চড়ে আছে সদাই সপ্তমে। মুখ হয়েছে পচা ভাগাড়।

হঠাৎ কোথা থেকে হৈ-হৈ করে হাজির হোল টন্‌শা।

বটুকদাস হাতে যেন আকাশের চাঁদ পেলো। সামান্য দু'চারটে কথা হোল। এলো খাবার। এলো মাংস। টন্‌শার জন্যে এলো —কাঁচি নয়—খাঁটি এক বোতল।

মিশে গেল আমে-দুধে।

প্রচার হয়ে গেল সারা তল্লাটে—রাতে গান হবে।...

হোল গান। একদিন নয় পরপর চারদিন।

গানের সুখ্যাতি আর ধরে না। দালাল নিয়ে আসতে লাগলো নিত্য নতুন বায়না। হাসি ফুটলো বটুকদাসের মুখে। টন্‌শার কদর বেড়ে গেল। দেখে কে বলবে যে এই টন্‌শাকেই দুমাস আগে অন্যায় ভাবে ফাঁকি দিয়ে দলছাড়া করে ছিল বটুকদাস ? টন্‌শা শুধু একটি বার মুখ ফুটে বললে হয়তো বা এখন তার পায়ের তলায় বুকই পেতে দিতে পারে বটুকদাস।

খুশি হোল টন্‌শাও। খুশি হোল মধুময়। হিংসেয় জ্বলতে লাগলো শুধু ছোট যুবরাজ হরিপদ।

দারুকেশ্বরে বায়না ছিল চারদিনের।

চৈত্রমাসে দারুকেশ্বরে গাজন উপলক্ষ্যে বিরাট মেলা বসে। পাহাড়ের ওপর মন্দির। দারুকেশ্বর আর মহাকালী। হপ্তাখানেক

মলা চলে। প্রচুর আয় হয়। তাছাড়া আছে বিরাট দেবোত্তর।

সেবাইৎ—ক্ষ্যাপা বাবা।

এ-অঞ্চলে ভীষণ নামডাক তাঁর। লোকে বলে সিদ্ধপুরুষ। তাঁর একটা মুখের কথায় আশপাশের পঞ্চাশখানা গাঁয়ের লোকের মরণ-বাঁচন নির্ভর করে। বলুক কারো মাথা আনতে। দুশো জন ছুটে যাবে। পাঁচ মিনিটে হাজির করবে ধড় আর মাথা আলাদা করে।

চেহারাও বটে ক্ষ্যাপা বাবার। ছ'ফুটের ওপর লম্বা। তেমনি চওড়া। যেন মূর্তিমান কালভৈরব। ঘোর তান্ত্রিক। মড়া জাগায়। পরনে রক্তাম্বর। সর্বাঙ্গে বিভূতি আর সিঁদুরের বীভৎস আলপনা। মাথায় জটা। গাঁজা আর কারণের কৃপায় চোখদুটো সদাই যেন আগুনের ভাঁটা। ক্ষণে ক্ষণে উদাত্ত মা-মা ডাকে মুহুর্মুহু বাজপড়ার হুঙ্কার। ভক্তিতে না হোক, ভয়ে আতঙ্কে অতি বড় দুঃসাহসীরও ঘাড় হিম হয়ে যায়।

ফ্যাঁসাদ বাধলো এই ক্ষ্যাপা-বাবারই বেয়াড়া আব্দারে।

পঞ্চম দিনে দলকে "বিদেয়" দেবার পালা। মধুময়কে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল বটুকদাস। ক্ষ্যাপা-বাবার হুকুম হোল, আর একদিন গান করতে হবে। "প্রণামীর গান" অর্থাৎ বিনি পয়সায়।

এমন প্রণামীর-গান মাঝে মাঝে "দেব-থানে" গাইতে হয় প্রায় সব দলকেই। অন্যসময় হলে আপত্তি ছিল না বটুকদাসের। গাইত। এখন কিন্তু কদিন ধরে দলের "বস্তির" দরুন তার অনেক লোকসান হয়ে গেছে। আর লোকসান দেওয়া তার সাধ্যাতীত। তাও যদিবা দলের সব্বাই বিনা "ঠিকা"-য় (রোজ-গণ্ডায়) রাজি হোত, তাহলেও কথা ছিল। বিনা-ঠিকায় কেউ রাজি নয়।

ক্ষ্যাপা-বাবাকে খুলে জানালো বটুকদাস সব কথা।

হুঙ্কার ছাড়লেন ক্ষ্যাপা-বাবাঃ অম্নি কইছিস্ কেনে রে বেটা? মার থানে প্রণামী গান করবি। তুমন চাল দিব, খেঁসারীর ডাল দিব, খেঁড়ো দিব, ডিংলা দিব, দুটা পাঁঠা দিব, বিশ বোতল কারণ

দিব। খা না কেনে সব, কতো খাবি !

"ডিংলা" অর্থে কুমড়ো। খেঁড়ো—কাঁকুড় ও চাল চালকুমড়োর যেন এক বিচিত্র বর্ণসঙ্কর।

হাতজোড় করে বটুকদাস নিবেদন করলোঃ উয়ারা যে ইতেও রাজি হইছে নাই বাবা।

রাজি তু করা না কেনে শালা !

ধমকে ওঠেন ক্ষ্যাপাবাবাঃ গান তুদের করিতেই হবে।

ঃ কী কর্যে করিব বাবা ? উশালারা যে করিবে নাই বলিছে।

ঃ করিবে নাই ? মানিবে নাই মা'র আদেশ ?

ঃ আজ্ঞা, বলিছে তো তাই।

ঃ এই, কে রইছিস্ রে !

ক্ষ্যাপা-বাবার প্রচণ্ড হুঙ্কার শুনে ছুটে এলো একপাল ভক্ত। হাতজোড় করে দাঁড়ালো হুকুমের অপেক্ষায়।

বটুকদাসকে দেখিয়ে ক্ষ্যাপা-বাবা আবার হুকুমজারি করলেনঃ বাঁধ ইটারে !

মুখের কথা থামাতে যা দেরি। স্তম্ভিত মধুময়ের চোখের ওপর নিমেষমধ্যে সবাই মিলে চ্যাংদোলা করে বটুকদাসকে তুলে দড়ি দিয়ে মোক্ষম করে বেঁধে ফেললো হাড়কাঠের পাশে পাঁঠা-বাঁধার খুঁটিটার সঙ্গে। আকস্মিকতায় মধুময়ের মুখ দিয়েও একটা রা বেরুলো না। মরা পায়রার মতন বটুকদাসের মাথাটা নেতিয়ে পড়লো বুকের ওপর। ভয়ে-আতঙ্কে সে বোধ হয় অজ্ঞানই হয়ে গেল।

জনকয়েককে সেখানে পাহারায় রেখে বাকি সবাইকে হুকুম করলেন ক্ষ্যাপা-বাবাঃ চল !

পিছু পিছু চললো সবাই। মধুময় ও মিশে গেল ভিড়ের মধ্যে।

হঠাৎ কী মনে পড়ায় বোঁ করে মন্দিরে ঢুকে পড়ে প্রকাণ্ড খাঁড়াখানা হাতে তুলে নিয়ে আবার বীরদর্পে এগোতে এগোতে হুঙ্কার ছাড়লেন ক্ষ্যাপাবাবাঃ আয় না কেনে শালারা !

আগে-আগে খাঁড়া হাতে মা-মা হুঙ্কারে মাটি কাঁপিয়ে ছুটে চললেন কালভৈরব ক্ষ্যাপা-বাবা। পিছনে ছুটলো তাঁর আজ্ঞাবহ যোয়ান মরদ সেই যত ভক্তের দল।

যাত্রার-দলকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল অতিথ-শালার সবচেয়ে বড় ঘরটায়।

বিরাট ঘর। একশো জন ধরে। মেঝেয় পাতা মোটা গদি। তার ওপর বড় বড় তাকিয়া। ছাদ থেকে ঝুলছে বাহারে ঝাড়লণ্ঠন।

দুপুরের খাওয়া সেরে সবাই আরাম করে ঘুমোতে শুয়েছে। অধিকারী গেছে বিদায় হতে। ঘুম থেকে উঠে বিকালবেলা ওরা পাড়ি জমাবে ভিনগাঁয়ে।

এমন সময়ে খাঁড়া-হাতে রুদ্রমূর্তিতে ক্ষ্যাপা-বাবার বেগে প্রবেশ। সঙ্গে তাঁর ক্ষিপ্ত সিংহনাদ।

ঃ মা, মাগো! বল্-বল্ শালারা, গান করিবি নাই কে বল্?

সে-মূর্তি দেখে দলশুদ্ধু সবার প্রাণ উড়ে গেল। চক্ষের নিমেষে যে যার বিছানা ছেড়ে দেয়াল ঘেঁষে শিটিয়ে বসে তাকিয়াগুলোকে সামনে ঢালের মতন আড়াল করে বাগিয়ে ধরে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো।

ক্ষ্যাপা-বাবা সত্যিই ক্ষেপে গেছেন। পাঁঠাবলির ধারালো প্রকাণ্ড খাঁড়াটাকে মাথার ওপরে বীর বিক্রমে ঘোরাতে ঘোরাতে ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতন অতবড় ঘরটাকে চষে ফেলতে ফেলতে মুহুর্মুহু বজ্রহুঙ্কার ছাড়তে থাকেনঃ বল্-বল্ শালারা! বল্! মা, মাগো!

প্রাণের দায়ে হাউহাউ করে কেঁদে উঠলো সবাইঃ বাবা! বাবা গো—

ঃ কোন শালা বলিছে গান করিবে নাই?

ঃ কেউ বলে নাই বাবা! করিব বাবা, করিব গান!

কঁকিয়ে ওঠে সবাই একসঙ্গে।

ঃ চোপ্‌রও শালারা !

গর্জে ওঠেন ক্ষ্যাপা-বাবাঃ হবে নাই তুদের গান করিতে। করিলেও শুনিব নাইরে পাষণ্ডগুলা ! মার আদেশ হইছে, কাটিব তুদের। সবকটারে কাটিব রে শালারা ! জয়মা ! মাগো—!

কান্নার শব্দ ওদের আরও এক পর্দা চড়েঃ বাবাগো ! দোহাই বাবা— !

দিগ্বিদিক জ্ঞান নেই ক্ষ্যাপা-বাবার। কণ্ঠে হুহুঙ্কারের বিরাম নেই। বিরাম নেই খাঁড়া ঘোরানোর।

ঝন্‌···ঝন্‌···ঝন্‌···

খাঁড়ার চোট লেগে পড়লো একটা ঝাড়। হাউ হাউ করে উঠলো আবার সবাই।

ঃ কাটিব ! সব কটারে কাটিব ! কিন্তু কুনদিক হত্যে কাটিব রে। কুন্‌ শালারে আগে কাটিব ?

ঠিক করতে পারেন না ক্ষ্যাপা-বাবা, কোন দিকে থেকে সুরু করে কাকে আগে কোপাবেন তিনি ? খাঁড়া ঘোরানোর কিন্তু বিরাম নেই। ধাঁ করে খাঁড়া বাগিয়ে হঠাৎ ক্ষ্যাপা-বাবা ছুটে গেলেন তবল্‌চি বামাপদর দিকে। প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়ে চোখ বুজে প্রকাণ্ড তাকিয়াটাকে সামনের দিকে ছুঁড়ে দিল বামা মাষ্টার।

ধপাস্‌···ধপ্‌···

খাঁড়ার কোপে তাকিয়া ফেঁসে গিয়ে উড়ন্ত তুলোয় ঘর ছেয়ে গেল। বেঁচে গেল বামা মাষ্টার অল্পের জন্যে।

কোরাস কাতরার্তনাদ উঠলো আবার ঃ বাবা গো-ও-ও-ও···

ঃ চোপরও শালারা !

হাঁফাতে হাঁফাতে হুঙ্কার ছাড়েন ক্ষ্যাপা বাবাঃ র'শালারা, র' এখন আগে তুদের উই বজ্জাৎ অধিকারীটিরে আজই রাতে বলি দিব মায়ের কাছে। তারপর তুদের পালা। রোজ একটি কর্যে।

খাঁড়া ঘোরাতে ঘোরাতে চরকির মতন ঘর থেকে বার হয়ে যান তিনি।

বাইরে আবার হুঙ্কার শোনা যায়ঃ এই শালারা! হাঁ কর্যে কী দেখিছ সব? দরজাটি বন্ধ কর্ না কেনে! তালা দে!

দড়াম্! ······

বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে গেল ঘরের একটিমাত্র দরজা। তার ওপর সশব্দে পড়লো তালা।

ঘরের সবাই ভয়ে-আতঙ্কে-কান্নায় আবার ডুক্‌রে উঠলোঃ বাবাগো! দোহাই বাবা ······

বন্দীত্ব থেকে অল্পের জন্যে বেঁচে গেল মধুময়। আর বেঁচে গেল টন্‌শা। সে তখন সিগ্রেট কিনতে বার হয়েছিল।

দূর থেকে ওরা দেখলো সব। শুনলোও। দুর্ভাবনায় মধুময়ের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো।

বললোঃ চলো টন্‌শা, পুলিশে খবর দিই।

টন্‌শা হেসে উঠলো।

বললোঃ হাই শুন মোর মাষ্টারের কথাটি! পুলিশ ইখানে পাইছ কুথায় গো? ফাঁড়ি রইছে ইখান হত্যে বাইশ কোশ তফাতে। আর তুমি তো জান নাই মাষ্টার—পুলিশ দারোগা উ ব্যাটা ক্ষ্যাপা চণ্ডীরে কিছু বলিবে নাই।

ঃ কেন?

ঃ ই ব্যাটা ক্ষ্যাপা বাবারে ই-তল্লাটে সবাই ডর পায়, মান্যি কর্যে। কেউ ঘাঁটাইবে নাই।

ঃ তাহলে উপায়?

ঃ রও না কেনে। মজাটি দেখ খানিক। তারপর—

কথাটাকে অসমাপ্ত রেখেই পরমোল্লাসে হাসতে থাকে টন্‌শা। যেন একটা মহা ফুর্তির ব্যাপার ঘটেছে।······

গভীর রাত।

শাল-মহুয়া-কুর্চি-বাবলার জঙ্গল-ঘেরা দারুকেশ্বর থমথম্ করছে। নিস্তব্ধ। অন্ধকার।

বন্ধ ঘরে যাত্রার দলের ওরা কেঁদে-কঁকিয়ে নেতিয়ে পড়েছে। কেউবা ঘুমিয়ে পড়েছে।

মহাকালীর মন্দিরে তখনও একইভাবে বাঁধা আছে বটুকদাস। চিঁচিঁ করছে। থেকে থেকে তার মুখ দিয়ে বার হচ্ছে একটা দুর্বোধ্য গোঙানী।

ক্ষ্যাপা-বাবা পূজোয় বসেছেন। ঘন ঘন তাঁর কারণ পান চলেছে। চোখ দুটো হয়ে এসেছে নেশার ঘোরে ঢুলুঢুলু। থেকে থেকে হুহুঙ্কারে নাদ ছাড়ছেন: মা, মাগো! কালী করালী শিবশঙ্করী মাগো!

চমকে চমকে গেঙিয়ে উঠছে বটুকদাস।

পূজান্তে ক্ষ্যাপা-বাবা বলি দেবেন বটুকদাসকে। তাঁর নাকি যে কথা সেই কাজ। সন্ধ্যের পর থেকে স্থানীয় জনেরা কেউ কেউ ভয়ে বার হয়নি ঘর ছেড়ে।

অন্ধকার একটা ঝোঁপের মধ্যে কাঠ হয়ে বসে আছে একা মধুময়। দেখছে সব। নড়বার সামর্থটুকুও যেন তার লোপ পেয়েছে। সঙ্গে টন্‌শা নেই। সেই যে সন্ধ্যেবেলা এক ফাঁকে কোথায় উধাও হয়েছে সে, তারপর থেকে আর দেখা নেই।

একদৃষ্টে মধুময় চেয়ে আছে ক্ষ্যাপা-বাবার দিকে।

হঠাৎ……

একী ব্যাপার?

মধুময় জেগে আছে তো? না স্বপ্ন দেখছে?

বারকতক কষে চোখ রগড়ে নেয় মধুময়।

নাঃ, সত্যি।

চোখের ওপর দেখতে পেল মধুময়—মৃন্ময়ী মাতৃমূর্তির দেহ হতে

ধীরে ধীরে আবির্ভূতা হলেন দেহময়ী উলঙ্গিনী শ্যামা। একহাতে তাঁর শাণিত খড়্গ, অন্যহাতে নরমুণ্ড। লেলিহান রক্তজিহ্বা। কটিতে ছিনকর মেখলা।

অট্টহাস্য করে উঠলেন দেবী।

ধ্যানস্থ ক্ষ্যাপা-বাবা চমকে চোখ মেলে তাকালেন। বিস্মিত হলেন। তারপরেই দেবীর পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে ডুকরে উঠলেন মা, মাগো! দেখা তবে দিচ্ছিস মা!

মা আদেশ দিলেন: কেন আটকে রেখেছিস্ ওদের? ছেড়ে দে। এখুনি। নইলে মহা অনর্থ হবে। সর্বনাশ হবে।······

একটা মাত্র মুহূর্ত।

তারপরেই পাগলের মতন ছুটলেন ক্ষ্যাপা মাতৃ-আদেশ পালন করতে।···

মুক্তি তো পেলোই যাত্রার দল। পেলো বক্‌শিষ। পেলো আশাতীত সমাদর আর সেবা।

মদ আর মাংসের মই-মাড়ান চললো।

দুদিন ধরে ফুর্তি আর আমোদের পর বার বার ক্ষমা চেয়ে ওদের বিদায় দিল ক্ষ্যাপা-বাবা।

দল এলো কাদাশোল-এ। তিন দিনের বায়না এখানে।

আর এখানেই হোল বটুকদাসের কলেরা। হয়তো ক'দিনের অনিয়মিত মদ–মাংসের অসংযমের প্রতিক্রিয়া।

দলশুদ্ধ্ লোক ভয়ে আঁৎকে উঠলো। আঁৎকে উঠলো গাঁয়েরও লোক। বটুকদাসের ঘরের ত্রিসীমানা মাড়ানো ছেড়ে দিল তারা। রোজগারে বার হয়ে বিদেশ-বিঁভুই-এ পরের উপকার করতে গিয়ে নিজের জান দিতে দলের কেউ রাজি নয়।

একা ঘরে পড়ে-পড়ে চিঁ চিঁ করতে লাগলো বটুকদাস।

এগিয়ে গেল শুধু টনশা আর মধুময়। মধুময় গেলই শুধু;

করতে তাকে কিছুই দিল না টন্‌শা।

বললো ঃ তুমি পারিবে নাই মাষ্টার! ইটা তুমার কর্ম না।

ঃ কেন?

ঃ আরে, জীবনে তুমি মেঁয়্যে চিনিলে নাই কুনদিন, জান নাই উয়াদের রীত। বেটি ওলাইচণ্ডীর মওড়াটি তুমি নিব্যে কী কর্যে?

বুক দিয়ে বটুকদাসকে আগলে পড়লো টন্‌শা।

ছোট্ট গাঁ। দশ-বিশ কোশের মধ্যে ডাক্তার বদ্যি নেই। তবু খুঁজে পেতে টন্‌শা কোথা থেকে ধরে নিয়ে এলো বুড়ো এক কবিরাজকে দুহাতে নির্বিকারে ঘাঁটলো সে বটুকদাসের মল আর বমি। রাত জেগে সেবা করলো। বালিভর্তি কলসীতে জল ফিলটার করে খাওয়ালো।

তিনদিন তিনরাত ধস্তাধস্তির পর যমের মুখ থেকে টন্‌শা ফিরিয়ে নিয়ে এলো বটুকদাসকে।

প্রথম কথা বললো বটুকদাস ঃ আর জন্মে তুই আমার বাপ ছিলিরে টন্‌শা, নির্ঘাৎ বাপ ছিলি।...

কাদাশোল থেকে দল চলেছে শালটিকরি।

চব্বিশ কোশ রাস্তা। মেঠো রাস্তা ভেঙে অগ্নিস্রাবী মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডকে মাথায় নিয়ে চলেছে ওরা ক'খানা গরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে। আকাশে-বাতাসে গলিত লাভার তপ্ত সান্নিধ্য। সামনে-পিছনে, ডাইনে-বাঁয়ে লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নেই। শুধু উচুনিচু রাঙা মাঠ আর মাঠ।

মাঠের মাঝখানে কটা সোনামুঠি গাছ পেয়ে ওরা তার স্বল্প ছায়ায় একটু বিশ্রামে বসেছিল।

সেইখানেই হঠাৎ......

পরপর দু বার দাস্ত আর একবার বমি করে এলিয়ে পড়লো টন্‌শা। কলেরা।

ঘুচে গেল বিশ্রাম। ভুলে গেল বটুকদাস তার ঋন আর কৃতজ্ঞতার কথা। মুহূর্তে আবার গাড়ি বোঝাই হয়ে সবাই উঠে বসলো।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল মধুময়।

বটুকদাসকে জিজ্ঞাসা করলো: আর টন্‌শা?

পলায়ন-তৎপর বটুকদাস নিদারুণ বিরক্তিভরে ফুঁসিয়ে উঠলো: থোও না কেনে মাষ্টার উ শালার কথাটি। নিজে বাঁচিলে মায়ের নাম। উশালা তো মরিবেই। উয়ার তার গোটা দলটিকে নিকেশ করিবে? উঠ-উঠ মাষ্টার গাড়িতে!

উঠতে পারলো না মধুময়। অনেক সাধ্যি-সাধনাতেও না। দলের একজন হয়েও সে দলছাড়া। স্বভাবে আগলে রইল টন্‌শাকে।

জানিয়ে দিল, এমন অবস্থায় টন্‌শাকে একা ফেলে রেখে ও যেতে পারবে না।

বিস্মিত হোল সবাই ওর বোকামী আর গোয়াতু´মিতে।

অপেক্ষা কিন্তু করলো ওর জন্যে। যাবার আগে বটুকদাস দয়া করে ওদের জন্যে ছেড়ে গেল একখানা গরুর-গাড়ি।

আর বলে গেল: কাজটি কিন্তু ভাল করিছ নাই মাষ্টার। ভাল, তুমার কর্ম তুমি বুঝিবে। বাঁচে যদি উ শালা, শালটিক্‌রিতে আবার উয়ারে নিয়্যে "জয়েন" কর‍্যো!……

এগারোখানা গরুর গাড়ি চললো দলকে নিয়ে শালটিক্‌রির দিকে। দলছাড়া দুজনকে নিয়ে বাকি একখানা ফিরলো উলটো দিকে আবার কাদাশোলের পথে।

ওরা চলেছে—সামনে জীবনের পথে। এরা পিছু হটেছে জীবনের আশায় মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে।

ওদের বাঁচিয়ে জীবন দিতে বসেছে টন্‌শা। টন্‌শার জন্যে

নিজেদের জীবন বিপন্ন করতে ওরা রাজি নয়। জীবন-সায়র-মন্থনে ওদের ভাগ্যে পড়েছে অমৃতভাণ্ড, টন্‌শার জন্যে সবটুকু হলাহল। ওরা ভাগ্যবান। টন্‌শা এক হতভাগা সৃষ্টিছাড়া।

টন্‌শার মুখের দিকে তাকালো মধুময়।

ফ্যাকাসে, নীল হয়ে এাসছে সে-মুখ। চোখ বুজে এসেছে। গলাও।

ফিস্‌ফিস্ করে বললো ঃ জানো মাস্টার, জীবনে অধর্মটি করি নাই কখুনও। ইবার শুধু গোটা দলটিকে ক্ষ্যাপাবাবার খাঁড়া হ্যতে বাঁচাইব বলে মা কালী সেজে ধাপ্পা দিচ্ছি। সিই অপরাধেই বুঝি—

চমকে উঠলো মধুময়।

ঃ তুমিই কালী সেজে···?

নিষ্প্রাণমুখে একচিম্‌টি প্রাণময় হাসি এনে টন্‌শা বললে ঃ হঁ। হে মাষ্টার। কেউ জানে নাই। কাউরে কই নাই। কেমন ধারা মেক-আপ্ আর পার্টটি কর্‌য়েছি কও তো? ইমন পার্ট আমি জন্মে আর কখুনও—

কথা শেষ হোল না টন্‌শার।

আর এক ঝলক বমি তুলে সে নীরব হয়ে গেল। জ্ঞান হারালো। হয়তো বা···

পিছন ফিরে তাকালো মধুময়।

দূর দিকচক্রবালের কাছে এগারোখানা গরুর গাড়ি একে একে বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল।···

টন্‌শা বাঁচেনি।

দুনিয়ার কাছে কিছু চায়নি ন্যাপলা টন্‌শা। কিছু পায়ওনি। তবু সে বেঁচে ছিল। আজও বেঁচে আছে। নাম পায়নি। অর্থ পায়নি যশও পায়নি দেশজোড়া।

তবু মরে গিয়েও আজও বেঁচে আছে ন্যাপলা। ন্যাপলার

প্রাণপুরুষ "টন্‌শা"-র মৃত্যু নেই।

অথচ যারা অফুরাণ পেয়েও আরও চেয়েছে, মধুময় কতবার দেখেছে, তারা সব হারিয়েছে। তারা মরেছে। শোচনীয় অপমৃত্যু ঘটেছে তাদের জীবন্তেই।

প্রাচুর্য আর প্রসিদ্ধি। শেষেরটা বোধ হয় আরও জোরালো, আরও মাতাল করা।

ইতিহাস সাক্ষী দেয়, ঐ নাম আর ক্ষমতার মৃগতৃষ্ণিকার পিছু ধাওয়াই নাকি যুগে যুগে সভ্য মানুষের চরমতম কামনা।

ঐ প্রসিদ্ধি আর নামের উত্তাল ঘূর্ণাবর্তে তলিয়ে গেছে যত অসহায় ঐরাবত, তার কিছু কিছুর হিসেব আছে ইতিহাসে-পুরাণে। বেশির ভাগেরই কিন্তু নাম পাওয়া যাবে না আজও সেখানে। ইতিহাসের সেই সব আঁধারঘন অধ্যায়গুলোতে হয়তো আলোকপাত করবে অনাগত দিনের কোনও এক মশালচি।

সেই আলোতে পড়া যাবে কি দুর্বাসা মুখুজ্যের নামটা? অনাগত প্রত্নতাত্ত্বিক কি আজ থেকে কতশত বর্ষ পরে খুঁজে পাবে দুর্বাসা মুখুজ্যের কংকালটা? পেলেও কি সেদিনের মানুষ কল্পনা করে উঠতে পারবে, ঐ কঙ্কাল কে আশ্রয় করে রক্তমাংসের যে-মানুষটা একদিন মঞ্চপটে বেঁচে ছিল, কেমন ছিল সেই মানুষটা?

শুধু মধুময়কেই নয়, গোটা দলটাকে স্তম্ভিত করতেন ঐ আধুনিক দুর্বাসা।

অব্যর্থ ছিল তাঁর ব্যুমেরাং এর টিপ।

সেই ব্যুমেরাংই কিন্তু আর একদিন তাঁর হাত ফসকে……

বিচিত্রতম তাঁর ইতিহাস।

সত্যিই, সার্থকনামা লোক দুর্বাসা মুখুজ্যে।

যাত্রার-দলে অভিনয় করছেন আজ বিশবছর। কূট-চরিত্রাভিনয়ে যাত্রাজগতে তাঁর জুড়ি নেই। দুর্বাসা, শকুনি, কালনেমী, মীরজাফর,

চাণক্য, ভবানন্দ মজুমদার, চক্রধর দত্ত,-করেছেন আরও কতো কী। তবু সব বাদ দিয়ে কে কখন তাকে খেতাব দিয়েছিল "দুর্বাসা" সেটা আজ ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয়। সেই থেকে কিন্তু নিবারণ মুখুজ্যে সুপরিচিত হয়ে আসছেন "দুর্বাসা মুখুজ্যে"রূপে।

বয়েস হয়েছে বৈকি। পঞ্চাশের কম নয়। লম্বায় প্রায় ছ'ফুট। গৌরকায়। বড় বড় চোখ। খড়্গনাক। বয়সকালে নিঃসন্দেহে সুপুরুষ ছিলেন। বর্তমানে একটা সদাক্ষুব্ধ, প্রধূমিত অগ্নিগিরি।

কথা অবশ্য খুব কম বলেন। কথা বলতে কেউ সাহসও পায় না। কে যাবে ভাল কথার বদলে অযথা কড়া জবাব আর গালমন্দ সহ্য করতে? দলের লোকেরা তো চামচিকে। অমন যে "নায়েক"-রা যারা যাত্রাদলের সবার কাছে দেবতুল্য সমীহের লোক -- তাদের কে একজন কোথায় না জেনে একবার দুর্বাসাকে বলে ফেলেছিল: মুখুজ্যেমশাই, "হরিশ্চন্দ্র" পালা গাইলেন কাল রাতে, কই, কান্না পেলো না তো তেমন!

দুর্বাসা জবাব দিয়েছিলেন: পাবে। মেয়ে-বউয়ের গয়না বেচে দল বিদেয় দেবার সময় ঠিক কান্না পাবে।

বিস্মিত নায়েকের মুখে আর কথা ফোটেনি।

এহেন সুধাকণ্ঠকে সাধ করে কে ঘাঁটাবে? শুধু যা অধিকারী বটুকদাসের সঙ্গেই কালে-ভদ্রে দু-একটা কথা হয়। তাও ইশারায় যেখানে কাজ চলে, মুখের কথা মুখুজ্যে সেখানে পারতপক্ষে খয়রাত করেন না। বটুকদাসও না!

একটু যা সদয় শুধু মধুময়ের ওপর। ইদানীং আবার দলের জন্যে একটা পালা রচনা করায় মধুময়ের ইজ্জৎ আরো বেড়ে গেছে। সে-পালায় দুর্বাসার পার্টটিও হয়েছে মনোমত। তাই হয়তো মধুময়ের বেলাতেই যা একটু নরম দেখা যায় দুর্বাসাকে।

যে-কথা দুর্বাসাকে নিবেদন করতে ওদের কারও সাহস হয় না, তার বেলার ওরা মধুময়কে দূত ধরে। কাজ অবিশ্যি হাসিল করে

আনে মধুময়। তবু প্রতিবারই দুর্বাসা ওকে শাসাতে ভোলেন না : দেখো মাষ্টার, এই শেষবার তোমাকে বলে রাখছি, ফের যদি কোনও আটকুড়ির নন্দনের ছেঁড়া ল্যাঠা নিয়ে তুমি আমার কাছে এসেছো, তোমার ইজ্জৎ তো থাকবেই না, সে-কুত্তারও যঁদি না "ইয়ে" করেছি—

ইয়ে শাস্ত্রে দুর্বাসাও এক মহামহোপাধ্যায়।

এত অত্যাচার ওরা সহ্য করে কেন?

বাপরে! না করে উপায় আছে? দলের অন্যতম সেরা বক্স-আর্টিষ্ট। যাত্রাজগতের দিকপাল। কতভাগ্যে দলে পাওয়া গেছে দুটি হাজার টাকা দাদন দিয়ে। বায়না হয় ওরই নামে। যদি "লেগ দিয়ে" (ভুগিয়ে) চলে যায়? দল উঠে যাবে। সর্বনাশ হবে বটুকদাসের। সেই ভয়ে বটুকদাস থেকে সুরু করে সব্বাই সদাই তটস্থ।

আর কথা বলেন দুর্বাসা সিধু মাইতির সঙ্গে। সবচেয়ে বেশি কথা। ভাবের কথা নয়। বেশির ভাগটাই ঝগড়া। নিত্যি লেগেই আছে। প্রধানতঃ "অনার" নিয়ে।

পেশাদার যাত্রাদলের বিচিত্র যত প্রথার অন্যতম হোল "অনার্" বা সম্মানী।

বড় প্লেয়ারকে বাড়তি সম্মান দিতেই হবে। নইলে ইজ্জৎ রইলো কী? মুড়ি-মিছরি একদর হবে?

তাই—লরি চেপে পাড়ি দেবার-সময়ে বক্স আর্টিষ্টকে ঠাঁই দিতে হবে ড্রাইভারের পাশে। গরুর-গাড়ি বা নৌকা হলে মাথার ওপরে ছই না হোক, নিদেন ছেঁড়া চটের চাঁদোয়া একটা চাইই। সাজঘরে ছোট-মাঝারিরা মেঝেয় বসবে চ্যাটাই পেতে, মহারথীদের উচ্চাসন সাজের খালি বাক্সের ওপর। জলপানির বেলায় ওদের চেয়ে অন্ততঃ একটা পয়সাও বেশি দিতে হবে। খাবার পাতে সবার চেয়ে একটা

বাড়তি পদ চাইই,—নিদেন একটা ক্ষুদ্রতম ঠিকরে আলুসেদ্ধ, কিম্বা তুটো আলুর ছিলকি ভাজা। এমনি আরো অনেক অনেক। এ পান থেকে কোনদিন চুন খস্‌লেই নির্ঘাৎ অকাল বৈশাখী।

খেতে বসে হয়তো গর্জে উঠলেন তুর্বাসাঃ ঠাকুর।

ঃ আজ্ঞা বাবুমশাই? হাতজোড় করে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে ছুটে এলো ঠাকুর।

ঃ মাছের মুড়োটা আজ কোন কুটুমের পাতে?

ঠাকুর জবাব দেবার আগেই সামনের সারি থেকে সিধু বলে ওঠে দেশোয়ালী ভাষায়ঃ সিটা এই মোর পাতে হে!

ঃ কেন?—ক্র্যাকার ফাটে তুর্বাসার কণ্ঠেঃ আমার অনার?

ঃ আরে থোও না কেনে তুমার অনার! সিধু খোঁচা দেয়ঃ দলের হিরো আমি বটে। তুমার চেয়ে মোর অনারটি কম হইবে কেনে হে?

ব্যস, লেগে যাবে তুলক্লাম কাণ্ড। চোখ কপালে তুলে ছুটে আসবে বটুকদাস। হাতে ধরবে, পায়ে ধরবে। যেখান থেকে পারুক, রাতের বেলায় বিক্ষুব্ধমান তুর্বাসার পাতে জোগান দেবে ডবল সাইজের মুড়ো। তবে রক্ষে।

যেতে হবে ভিনগাঁয়ে। লরি বোঝাই। সবার শেষে রাজকীয় পাদক্ষেপে হাজির হয়ে তুর্বাসা দেখেন, ড্রাইভারের পাশে জাঁকিয়ে বসে আছে সিধু মাইতি। ছোট্ট লরি। তুজনের জায়গা হবে না সেখানে।

ব্যস, লেগে গেল চিরাচরিত মানের লড়াই। কেউ আর ছাড়তে রাজি নয়। বটুকদাসের প্রাণান্ত।

বেঁকে দাঁড়িয়ে গোঁ ধরে তুর্বাসা। বলেঃ দেখো "ইয়ে"র অধিকারী, এখুনি যদি না আমার আলাদা অনারের ব্যবস্থা করেছো তোমার "ইয়ের" দলের "ইয়ে করে এখুনি দিলাম আমি "ইয়ের চাকরিতে ইস্তফা!

প্রত্যেকটি "ইয়ে" রূপকে ও ধ্বনিমাধুর্যে অনুপম।

বটুকদাস বিশ্বকর্মা লোক। কোথা থেকে জোগাড় করে আনে একটা ঘোড়া। চোখে দেখেও বিশ্বাস করা শক্ত সেটা সত্যিই ঘোড়া, না ঘোড়া গাধা খচ্চরের এক বিচিত্র মুমূর্ষু মিক্সচার। হাতে পায়ে ধরে তাতেই সে চাপিয়ে দেয় দুর্বাসাকে। জানোয়ারটার পিঠে অমন একটা ভার চাপাতে আপনা থেকেই সে হয়ে যায় ধনুকাকার।

তবু অনার অক্ষুন্ন রেখে সেই পক্ষীরাজ হাঁকিয়েই আরম্ভ হয় দুর্বাসার বিজয়াভিযান।...

ঠোকাঠুকিটা সব চেয়ে ভাল জমে অভিনয়ের সময়ে।

দুর্বাসা হয়তো একদিন নিজের জন্যে বেছে রেখেছেন সবুজ এক জোড়া বাহারে নাগরা। বেঁকে দাঁড়াবে সিধু মাইতি। সে জোড়া তার চাইই। হিরোর চেয়ে বুড়োর বাহারে জুতো হলে লোকে বলবে কী? হিরোর অনার তো পাংচার হবেই, দলেরও নিন্দে।

অর্জুনকে বাদ দিয়ে শকুনি গায়ে চড়াবে গোলাপী বেনারসী ওড়না? মহাভারত অশুদ্ধ হতে তাহলে আর বাকি রইলো কী?

অতএব এসব ক্ষেত্রে অনারের লড়াইয়ে দুর্বাসাকে সিধুর কাছে হার মানতে হয়। শোধ নিতে দুর্বাসাও ভোলে না। রাম রাবণের পালা একবার এলে হয়, ব্যাস! বিভীষণ রূপী দুর্বাসার আপাদ-মস্তক সেদিন ঝলমল। বনচারী রাম বেশী সিধু সেদিন অনার-এ হেরে গিয়ে গেরুয়া কোর্তা গায়ে দিয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে মন মরা হয়ে।

শোধ নেয় আসরে বার হয়ে।

সুরু আর ধরতাই এর মাঝে এন্তার উড়োকথা বলে ওরা দুজনেই। তার মধ্যে দ্ব্যর্থক ব্যক্তিগত আক্রমণও জুড়ে দেয়। সুরু হয়ে যায় দুই 'অনার' প্রার্থী রথারথীর তুলক্লাম দ্বৈরথ। যেন যাত্রা নয়, কবির লড়াই। দর্শকরা অবিশ্যি সেটা টের পায় না। বরং দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর এহেন আপ্রাণ দ্বন্দ্বের ফলে সীনগুলো ওৎরায় চমৎকার।

হাততালির ঝড় বন্যা বয়ে যায়।

বটুকদাসও খুশি হয়। নাম্ হয় তারই দল আর অভিনেতার।···

এহেন অহি নকুল সম্পর্ক যাদের, তাদের দুজনের ভাবও আবার তেমনি অবিশ্বাস্যরকম নিবিড়।

ভাব জমে রাতের অভিনয় শেষে সবাই যখন ক্লান্ত দেহে ঘুমিয়ে পড়ে। চুপিচুপি মিতালী বসে তখন ওদের দুজনের। সিধু নিয়ে আসে বোতল বোতল কাঁচি বা চোলাই মদ। সাঁতার দেয় ওরা তরল গরলে। দুর্বাসা নিজে কোন দিন কাঁচি জোগাড় করে আনে না। টাকা দেয়। জোগাড়ের ভার সিধুর ওপর। এক্ষেত্রে শুধু হার মানে সিধু অনারটুকু দুর্বাসাকে দিয়ে।

কারণও আছে।

বটুকদাস একদিন চুপি চুপি বলেছিল মধুময়কে ঃ উ দুটাই সমান পাষণ্ড হে? সিধেটি তো হইছে মদের মাতাল, আবার জুয়ার মাতালও বটে। জুয়া খেল্যে খেল্যে সোনারচাঁদ হিরোটি আমার সর্বস্ব হারিছে। দেনা করিছে উই দুর্বাসার ঠেঙে একটি রাশ। চুলের টিকিটি পর্যন্ত বাঁধা দিছে।

অবশ্য মদের বোতল জোগাড় করতে সিধুকে বিশেষ কষ্ট পেতে হয় না। পাশের মাঠেই আছে মেলাতলা। যেতে আসতে যা দেরি।

মদ আনে সিধু। আকণ্ঠ পান করে দুজনে। তারপর আবার বার হয়ে যায় সিধু মেলার দিকে। জুয়া খেলতে। ভীষণ নেশা। দুটো দিন না খেয়ে থাকতে পারে সিধু। জুয়া না খেলে একটা রাতও নয়।

এদিকে একা ঘরে দুর্বাসা তখন···

প্রথম যেদিন টের পেয়েছিল মধুময়, ঘৃণায়-বিস্ময়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল।

রূঢ়ভাষী হোন, বদমেজাজী হোন, দুর্বাসা তাঁর ব্রাহ্মণত্ব আর

সাত্বিকতা সম্পর্কে সদা সচেতন। ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করেন। স্নানের পর নিত্যপূজায় যায় তাঁর ঘণ্টাখানেক। উন্নত গৌর ললাটে সদাই জ্বল্‌জ্বল্‌ করে একটা চন্দনতিলক। খাওয়ার সময়ে তাঁর জাতবিচার আর ছোঁয়াছুঁয়ির বাতিকে দলের সবাই শিটিয়ে থাকে। গলায় শোভা পায় শুভ্র উপবীত। লম্বা চুলের মধ্যে একটা সযত্ন লালিত শিখার অস্তিত্বও টের পাওয়া যায়। যেন গৌরকায় এক আধুনিক কৌটিল্য।

এহেন সাত্বিক দুর্বাসা নিত্য রাতজাগার ধকলে মদ না হয় খায়। তাই বলে আবার···

ওকে অবাক হ'তে দেখে বটুকদাস হেসে বলেছিল : অবাক লাগিছে, না হে মাষ্টার ? যাক না কেনে আর দুটা বছর আর অবাক লাগিবে নাই। আসল কথাটি কি জানো হে মাষ্টার ? ই মানুষগুলো বড় বিচিত্র জানোয়ার হে, আদি-অন্ত পাবে নাই। তাই দেখ না কেনে, জঙ্গলের জানোয়ারগুলাও মোদের ডর পায়।

স্বীকার করতেই হয়েছিল মধুময়কে, মানুষ বিচিত্র জীব, আদি-অন্ত পাওয়া ভার।

নইলে প্রতি নিশীথে সাত্বিক দুর্বাসা মুখুজ্যের ঘরে গভীর অন্ধকারে আবির্ভাব ঘটবে কেন সন্তর্পিতা এক একটি রহস্যময়ীর ?

বটুকদাস আরও বলেছিল ঃ ইটা কিছু নূতন না হে মাষ্টার। উ মোর বাপের ঠাউর দুর্বাসার ইটিই হইছে বারমেসে স্বভাব।

কৌতূহল চাপতে পারেনি মধুময়। বটুকদাসের কাছে জানতে চেয়েছিল দুর্বাসার পূর্ব ইতিহাস।

চুপিচুপি জানিয়েছিল বটুকদাস।

···অবস্থাপন্ন বনেদী ঘরের ছেলে। গ্র্যাজুয়েট। অভিনয় দুর্বসার আবাল্যের নেশা। যথাকালে বিয়েও হয়েছিল একটি অপরূপা গরীবের মেয়ের সঙ্গে। কিন্তু স্বামীর ঘরকরা নাকি সে রূপবতীর অদৃষ্টে বেশিদিন ঘটেনি।

: কেন ?

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেছিল মধুময়।

: কে জানে !

বিরক্তিভরে চোখমুখ বিকৃত করে জবাব দিয়েছিল বটুকদাস: ইসব বড়ঘরের বিরাট বিরাট কাণ্ড হে ? পাঁচশো গজ দড়ি নামাও না কেনে, তলটি পাবে নাই। কেউ কয়, দুর্বাসা তারে তাড়ায়্যে দিছে। কেউ কয়, ওলাউটায় শিঙা ফুঁকিছে। আবার ইমন কথাটিও শুনিতে পাই হে যে উই ডাকাতটিই নাকি সিটারে নিজহাতে খুন করিছে।

: বলো কি ?—শিউরে উঠেছিল মধুময়।

: হাঁ হে।

বটুকদাস উপসংহার টেনেছিল: সি থেকেই উই ক্ষ্যাপাচণ্ডীর ইমন মূর্তিটি। ঘর ছাড়িছে, স্বজন ছাড়িছে। ভিড়িয়ে গানের দলে মুখ হইছে আস্তাকুড়। মেজাজটি হইছে বটে তপ্ত খোলা। আর সব ছেড়্যে সার ধরিছে মদ আর উই সর্বনাশীগুলা।

একটু থেমে আবার জোগান দিয়েছিল বটুকদাস: উই হে দেখিছ মোর ক্ষ্যাপাচণ্ডীর রাগটি, আসলে উটা তুমার-আমার কারো পরে নয় হে। সিই বউ-কেলেঙ্কারীর পর হত্যে সারা মেয়্যেজাতটির পরে দেবতার অমন রাগটি হইছে বটে। তুমার আমার পরে লাগে সিই রাগের ছিটা ফোঁটা হল্‌কাটি।

: মেয়েদের ওপর রাগই যদি, তাহলে সেই মেয়েদের সঙ্গেই আবার এমন করে—।

: ইটা বুঝিলে না হে মাষ্টার ?

মুরুব্বির মতন হেসে জবাব দিয়েছিল বটুকদাস: রাগ হইছে দু প্রেকার। যার পরে রাগ তার ছায়াটি মাড়াইবে নাই, ই হোল এক। আর দুইনম্বর হইছে—রাগের জনারে পিষে মারিবে, সর্বনাশ করিবে। ই মোর ক্ষ্যাপা ভৈরব হইছে বটে দুই নম্বর কালাপাহাড়। বুঝিছে ?

বুঝতে আর বিশ্বাস করতে বিলক্ষণ কষ্ট হয়েছিল মধুময়ের।

পরে একসময় সিধুও সমর্থন করেছিল বটুকদাসের কথাটা।

বলেছিলঃ হাঁ হে, ইটা একটা খাঁটি কথা বলিছে বটে অধিকারী। দুর্জয় রাগ উই দুর্বাসার মেয়্যেগুলার উপর। কাজ ফুরালেই ফর্সা। কান্নাকাটি মানিবে নাই, আকুতি-মিনতি শুনিবে নাই। মোদের উই দুর্বাসাটি মানুষ না হে মাষ্টার, পাথর, পাথর!

হঠাৎ তুমুল হয়ে উঠলো দুর্বাসা আর সিধুর মানের লড়াই আর আকচা আকচি।

বরাবরই ছিল, কিন্তু এমনটা নয়। এ যেন নতুন আর কিছু! মধুময় টের পেলো, বটুকদাসও একদিন বললো, দুতিন দিন ধরে ওদের সেই রাত-মিতালী পর্যন্ত বন্ধ। দুর্বাসাকে রাতের রসদ জোগান দিচ্ছে দলের দালাল অনন্ত কয়াল।

বুঝলো সবাই, নির্ঘাৎ একটা নতুন কোনও উপসর্গ দেখা দিয়েছে। অথচ সেটা যে কী, তা কেউ টেরও পেলো না। দুর্বাসার কাছে ঘেষারই সাহস নেই কারো, তা জিজ্ঞাসা করবে কে?

সিদুকে জিজ্ঞাসা করেও সিধে জবাব পাওয়া যায় না।

গর্জে ওঠেঃ ই বাবু আমার লাটসাহেবের ছাতার বাঁট আইছেন গো? যত পায়, তত চায়। আবার তম্বি! ধার দিছে তো মাথাটি কিনিছে নাকি হে?

ঃ হইছে কী বটে? কেউ হয়ত আত্মীয়তা পাতিয়ে জিজ্ঞাসা করেঃ ইত চিল্লাইছ কেনে?

ঃ চিল্লাইছি মনের আনন্দে হে! হাত পা ছুঁড়ে আরও দুপর্দা গলা চড়িয়ে তেড়ে আসে সিধুঃ আনন্দে নাচিব এবার দুহাত তুল্যে! নাচিবে?

প্রস্তাব শুনে রণে ভঙ্গ দেয় প্রশ্নকর্তা।

রহস্যটা প্রকাশ পেলো মধুময়ের কাছে তিনচারদিন পরে।

বোধহয় গোপন কথাটা নিজের মধ্যে চেপে রেখে হাঁফিয়ে উঠেছিল সিধু। তাই নিরিবিলিতে মধুময়কে একা পেয়ে বুক হাল্কা করে ফেললো।

কোন একটি লোকবধুর সঙ্গে নাকি ভাব জমেছে সিধুর। ঠিক সন্ধান পেয়েছে দুর্বাসা। আব্দার ধরেছে, সমর্পন করতে হবে তাকে দুর্বাসার কাছে। সিধু রাজি নয়।

ঝগড়াটা তাই নিয়ে।

দুর্বাসা শাসিয়েছে, সিধু রাজি না হলে দেনার দায়ে সে ওর ভিটে মাটি পর্যন্ত নিয়ে নেবে।

ঃ কতো টাকা দেনা তোমার ওঁর কাছে?—জিজ্ঞাসা করেছিল মধুময়

ঃ কে জানে?—বিপর্যস্ত জবাব দিয়েছিল সিধুঃ নিত্যি দেনার হিসাবটি কাঁহাতক আর মনে রাখিব হে? জানে উই মহাজন নিজে। আসল আছে, তার পরে আবার সুদ হইছে। বলিছে তো গোরাক্ষসটি যে সুদে-আসলে নাকি বিস্তর হইছে। নীলাম ডাকিবে দেনার দায়ে।

ঃ তাহলে উপায়?

ঃ উপায়—ধুঁধুল।— নির্বিকার বেপরোয়ার মতন বলে উঠেছিল সিধুঃ নিকৃনা কেনে নীলাম ডেকে কী নিবে! ভিটে-মাটিতো মোর বিস্তর হে। ছয় কাঠা পাথুরে জমি আর একটি পিতেমোর যুগের নি-খোড়ো দোচালা। যা'—উতেই যদি তোর তৃপ্তি বটে, নে না কেনে নীলাম ডেকে। তুর্ উই রাবুণে ক্ষুধাও মিটুক্ আম্মো ঋণ-মুক্ত হয়ে বাঁচি—হ্যাঁ।.....

যার উদ্দেশ্যে সিধুর এত আস্ফালন, কানে তাঁর নিঃসন্দেহে সবই যায়, মনেও থাকে। শোধ নেন অনারের লড়াইএ—সুযোগ পেলেই।

খেতে বসে সেদিন এমনি এক মহাসুযোগ জুটে গেল।

মাছ ছিলনা। পাওয়া যায়নি। তাই নিরামিষের পালা। পেশাদার যাত্রাদলের চিরাচরিত প্রথা, উপর্যুপরি দুদিন পাতে মাছ জোটাতে না পারলে, তৃতীয় দিনে পাতে মাংসের ঝোল পড়বেই। তাই আপত্তি ওঠেনি কারও পক্ষ থেকে। মাছ ছিল না কারো পাতে।

শুধু সিধুর পাত-ছাড়া।

কদিন ধরে সিধুর পেটের গোলমাল চলছিল। তাই বটুকদাস নাকি কোন্ পল্লী-গৃহস্থের বাড়ি থেকে চেয়ে এনেছিল ইঞ্চি পাঁচেক এক মাছ।

দুর্বাসার শকুণদৃষ্টি এড়াতে পারলো না ঐটুকু মাছটা।

এক গোঁ ধরে বসে রইলেন ঃ হয় আমারও অনার্ বজায় রাখো, নয়তো তোল তোমার হিরোর পাত থেকে ঐ মাছ!

হাত বন্ধ হয়ে যায় সব্বার। একটা রুগ্ন মানুষের পথ্য নিয়ে আর একজন মানুষের এহেন অমানুষিকতায় অবাক হয়ে গেল সবাই।

কাঠ হয়ে ভাত কোলে নিয়ে বসেছিল সিধু। হঠাৎ উঠে গেল মুখের ভাত আর যত অনর্থের মূল সেই মাছটাকে পাতে অক্ষত রেখে।

খুশি হলেন দুর্বাসা। অনার্ বজায় রেখে শোধ নিয়ে পাত খালি করে উঠে গেলেন তিনি।

সেইদিন সন্ধ্যেবেলা মধুময়ের সঙ্গে নিরিবিলিতে আবার দেখা হোল সিধুর।

চুপিচুপি সিধু বললো : হারটি আমায় মানিতেই হইছে মাস্টার। রফা একটা এখুনি হয়্যে গেছে উ শয়তানের সাথে। দিব— আজই দিব উই রাক্কোশের গহ্বরে আর একটি নরবলি।

মধুময় বলে ঃ ভালই করেছো, মিটিয়ে নিয়েছো।

ঃ সিজন্য না হে মাস্টার, সিজন্য নয়। বাধ্য হইছি বটে অন্য কারণে।

কারণটা খুলে বলে সিধু। ঘর-বাড়ির মায়ায় দুর্বাসার সঙ্গে এহেন সর্তে সন্ধি পাতায়নি সে, মাছ নিয়ে ঝগড়ার প্রতিক্রিয়াতেও নয়। এসব অনারের চেয়ে ঢের বড়ো অনার সিধুর একটিমাত্র অনূঢ়া যুবতী বোন।

তারই বিয়ে দেবে বলে একটা মেয়াদী ইন্‌সিওর করিয়েছিল সিধু। নমিনি-র নামটা জানানো বাকি ছিল। দেনার দায়ে সেই পলিসিও বাঁধা পড়েছে দুর্বাসার কাছে। কদিন ধরে ভয় দেখাচ্ছিলেন টাকার বদলে সিধু তাঁকেই নমিনি করে দিক। বেহাত করে নেবার মতলব আর কি। তাই নিজের অনার্‌এ জলাঞ্জলি দিয়ে আইবুড়ো বোনের ভবিষ্যৎ বাঁচাতে সিধু রাজি হয়েছে দুর্বাসার সর্তে।

কদিন পরে সে-রাতে অভিনয়ের পর ক্লান্ত দেহে নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়েছিল মধুময়। ঘুম কিন্তু জুটলো না অদৃষ্টে। হঠাৎ একসময় দুর্বাসার ঘর থেকে ভেসে এলো নারীকণ্ঠের আর্ত কান্নার সঙ্গে সঙ্গে দুর্বাসার চিৎকার। চমকে উঠে ছুটে গেল মধুময়। ছুটে এলো বটুকদাস। এলো সিধু। আরও অনেকে। ভিড় জমে গেল। সেই ভিড় ঠেলে দুর্বাসার ঘর থেকে তীরের গতিতে ছুটে বার হয়ে অন্ধকারে মিশে গেল এক রহস্যময়ী অবগুণ্ঠিতা। সিধু তার পিছু নেবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো।

দেখা গেল—দুর্বাসা বসে আছেন পাথর হয়ে। নিস্পন্দ, নীরব। বহু জিজ্ঞাসাতেও সাড়া এলো না। শুধু থেকে থেকে পাথরের দুর্বাসার চোখদুটো অর্থহীন শূন্য দৃষ্টিতে ঘুরতে লাগলো জন হতে জনান্তরের মুখের ওপর।

সবাইকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলো বটুকদাস। দুর্বাসার কাছে রইলো শুধু সিধু।···

পরদিন সকাল থেকেই আবার যথারীতি ঘুরতে লাগলো যাত্রা-দলের চাকা। যেন কিছু হয়নি কোনদিন। খাওয়ার সময় এলো সব্বাই। এলো সিধু। দুর্বাসাও এলেন, সমান গম্ভীর। বটুকদাস নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দুর্বাসার পাতে পরিবেশন করালো প্রকাণ্ড একটা মাছের মুড়ো।

সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে চমকে দিয়ে আর্তকণ্ঠে ডুক্‌রে উঠলেন দুর্বাসা ঃ আমায় নয় বটুক, আমায় নয়! এ-অনার্‌ দাও সিধুর পাতে। আমার সব অনার্‌ হার মেনেছে ওর কাছে।

কথার সঙ্গে সঙ্গে চল্লিশজোড়া বিস্মিত চোখের সামনে দুর্বাসা নিজের হাতে সেই মাছের মুড়ো সত্যিসত্যিই তুলে দিলেন সিধুর পাতে।...

রহস্যটার সমাধান সেইদিনই সিধু করে দিয়েছিল মধুময়ের কাছে।

চুপি চুপি বলেছিল ঃ তা আমার দোষটি কি কও? তা আমি জানিব কি কর্‍্যে হে উই আহ্লাদীটিই আসলে মোর ক্ষ্যাপাচণ্ডী দুর্বাসার সেই বউটি বটে?

মধুময় মুহূর্তে যেন বজ্রাহত হয়ে গিয়েছিল।

দল গিয়েছিল নেহালিয়ায়। জেলা মুর্শিদাবাদ।

সেবার দলের বড় মন্দা হাল। ছোট অধিকারী হলধর সানা মারা গেছে। তার দু-আনি অংশ কিনে নিয়েছে দলেরই ক্ষুদে হিরো অচিনকুমার। হিরো থেকে প্রমোশান্‌ পেয়েছে হঠাৎ হিরো কাম-অধিকারীতে। ফলে ধরাকে সরা দেখছে সে।

বটুকদাস দলে থাকলেও বা কথা ছিল। সেও আসতে পারে না। বাতে শয্যাশায়ী।

ম্যানেজার একজন আছে বটে সে আবার ঢাকের বাঁয়া। চাকরি বাঁচাতেই ব্যস্ত, তা আবার নতুন অধিকারীর ওপর কথা বলবে কী?

আর বললেই বা শুনছে কে ?

অস্থায়ী অধিকারীর দাপটে আর বদ্‌মেজাজে পুরোনো এ্যক্টর সবাই প্রায় মান বাচাতে সময় থাকতে সরে পড়েছে অন্যদলে। অনেকের চাকরি গেছে অচিনকুমারের মন না পাওয়ায়।

মধুময়ের ওপর তখনও চোট পড়েনি। তবু সদাই তটস্থ হয়ে থাকে সে। কখন কী হয় !

ভাঙাদলে গস্ত করা হোল নট-দিবাকরকে।

তাঁকে নিয়েই দল ঝুলনে বার হয়েছিল মুর্শিদাবাদ সফরে। অচিনকুমারের উদ্দেশ্য ছিল, দুর্গাপূজা পর্যন্ত এসব ধারেই সফরে কাটিয়ে পালাগুলোকে রপ্ত করিয়ে নেবে নট-দিবাকরের। তারপর পাড়ি দেবে কোলিয়ারী অঞ্চলে আর রাঢ়দেশে।

অচিনকুমার নিজে যেখানে হিরো, আর তার ওপর আবার ফাউ আছে নটদিবাকর, সেদলে আর কারো দরকারই বা কী ? ওতেই আসর আর বাজার মাৎ হয়ে যাবে।...

নেহালিয়ায় শোনা গেল—গঙ্গার ওপারে বড় নগর। আর এই বড়নগরই ছিল রানী ভবানীর আবাস-স্থল।

পরদিন সকালে নৌকো ভাড়া করে অনেকেই গেল রানী ভবানীর ভিটে দেখতে। ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তারা জোর করে টেনে নিয়ে গেল মধুময়কে।

দেখেছিল মধুময় রানী ভবানীর ভিটে। ধ্বংসস্তূপ, আর আগাছার জঙ্গল। যেন দানব বিধ্বস্ত অমরাপুরি !

দেখে একটা বিদ্রোহী জিজ্ঞাসা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল মধুময়ের মধ্যে। ফুঁসিয়ে উঠেছিল তিক্ততায়।

যা ছিল বিরাট আর মহান, তারই কঙ্কালকে কৌতুক আর কৌতুহলের উপাদান করে এভাবে অপমান করা কেন ? বিস্মৃত

অতীত আর কবরের মড়া একই জিনিষ। তাকে জাগিও না! খুলো না—খুলো না আর কফিনের ঢাকা! ওদের ঘুমোতে দাও!

সভ্যমানুষ মানে না এ মানা। প্রদর্শনী খুলে শ্রদ্ধেও কে করে তোলে হাস্যাস্পদ। চতুর বৈশ্য ব্যবসায়ী আবার তাকেই করে তোলে ব্যবসায়ের স্বর্ণপ্রসূ পণ্য।

যে অভিশাপ দেয়, তা শোনার কান কি কারো নেই?

যাদুঘরের ডাইনোসর কঙ্কালটা—আজ কি আর সেই ডাইনোসরের মর্যাদা পায়? যার দূরাগত পদধ্বনিতে জীবজগৎ ভয়াকুল হয়ে উঠতো, তাকে দেখে আজ টিক্‌টিকিটাও ভয় পায় না। অতীতের সেই ভয়ঙ্কর আজ হয়ে উঠেছে নেহাৎ তুচ্ছ এক নির্জীব আসবাব।

এরচেয়ে বড় অপমান ডাইনোসরের আর কী হতে পারে?

না না, বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে তোমাদের প্রচেষ্টাকে একটা মহান কিছুর রঙ চড়াবার চেষ্টা করো শ্রীযুত প্রত্নতাত্ত্বিক! তোমরা যাকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন বলো, আসলে সেটা যে ওদের চরম অপমান সেটা কেন বোঝ না?

সারে হিন্দোস্থানের মালেক বাহাদুর শা-কে রাজ্যহারা, সর্বহারা বন্দী করার পরেও ঠাট্টা করতে ছাড়েনি বানিয়া ইংরাজ।

বলেছিল সুসভ্য ইংরাজ প্রতিনিধিঃ মুঘল সূর্য অস্ত গেছে বলে কি তাদের বাদশার ক্ষুরধার হাতিয়ারে আজ আর ফড়িংও কাটা পড়ে না? ···

নিষ্ঠুরতম বিদ্রূপ। বাহাদুর শার দীর্ঘশ্বাসের সংগে সেদিন কি কোনও মৌন অভিশাপ বার হয়ে আসেনি?

অতীত, বিরাটের অভিশাপ শোনবার কান সবার থাকে না। তা বলে তা মিথ্যে নয়।

ওদের ঘুমোতে দাও! অনিবার্যকে নিবারণ করতে চেও না আর! পারো যদি, আরও একটি উদার, একটু শ্রদ্ধাশীল হও ওদের প্রতি।···

ঃ একটা বিড়ি আছে নাট্যকার ?

প্রশ্নটা কানে যেতেই যেন নিদ্রাহতের মত চমকে ফিরে তাকিয়েছিল মধুময়। দেখেছিল, কখন এসে পাশে দাঁড়িয়েছেন নটদিবাকর।

ত্রস্তে সিগ্রেটের প্যাকেট আর দেশলাই বার করে দিয়েছিল মধুময়।

একটা সিগ্রেট্ ধরিয়ে পরম তৃপ্তিভরে একমুখ ধোঁয়া নাকমুখ দিয়ে বার করে দিয়েছিলেন নটদিবাকর। প্যাকেটটা ফেরৎ দিচ্ছিলেন। নেয়নি মধুময়।

ঘুরিয়ে বলেছিল ঃ ফেলে এসেছেন তো বিড়ির কৌটো ? জানি আমি। যা আপনাদের তাড়াহুড়ো করে আসার ধুম। থাক ওটা আপনার কাছেই। এখানে আর কিনতে পাচ্ছেন কোথায় ?

ঃ তুমি ?

ঃ আমার বেশি লাগে না। দরকার হয় চেয়ে নেবোখন।

বুঝতে কিছু বাকি থাকেনি নটদিবাকরের। মুখে কথা ফোটেনি তাঁর। মৌন তুটি স্তিমিত চোখে কিন্তু ফুটে উঠেছিল মুখর কৃতজ্ঞতা আর ধন্যবাদ।

তৃপ্তিভরে সিগ্রেট টানছিলেন নট-দিবাকর। পাশ থেকে মিলিয়ে দেখছিল মধুময়।

পাশাপাশি তুটো বিরাটের ধ্বংসাবশেষ তুটো মহান অতীতের কঙ্কাল। একটা জীবন্ত, অন্যটা নিষ্প্রাণ। বড় নগর আর নটদিবাকর। ধ্বংসের পরেও ওদের রেহাই নেই।

জনাব বাহাতুর শাকে আজও কারা যেন টেনে-হিঁচড়ে রাজপথ দিয়ে নিয়ে চলেছে কৌতুহলী জনতার চোখের ওপর।......

নট-দিবাকরের সঙ্গে মধুময়ের পরিচয় তাঁর জীবনের উপসংহারে— মাত্র কটা দিনের জন্যে। আদিযুগ আর মধ্যযুগের ইতিহাস শোনা

ছিল কিছুকিছু। প্রত্যক্ষ করার সুযোগ ঘটেনি।

তবু আশ্চর্যজনকভাবে তিনিও বিশেষ ঠাঁই পেয়ে গিছলেন ওর মনের সেই বহু বহুরূপীর এ্যালবামে—একেবারে গোড়ার দিকের অন্যতম একটা সেরা পাতায়।

নটদিবাকরেরও হয়তো সেটুকু বোঝায় ভুল হয়নি।

তাই অজানা ইতিহাসটুকু শেষলগ্নে নিজে থেকেই ওকে শুনিয়েছিলেন নটদিবাকর।

শুনতে শুনতে মধুময়ের চোখের সামনে সুস্পষ্ট ভেসে উঠেছিল···

শুধু মাঠ আর মাঠ।

অসম, রুক্ষ, রক্তাভ মাঠ। ধূধূ করছে। দিগন্তবিস্তারী। চৈত্র দিনের উত্তর মধ্যাহ্নে খর রোদে পুড়ে খাক হচ্ছে। লেলিহান স্বচ্ছ উত্তাপ প্রবাহে চোখের সামনে সবকিছু থরথর কাঁপছে। বাতাস নেই একচিমটি। তবু কোথা থেকে ভেসে আসছে কুর্চি-মহুয়ার তীব্র মিষ্টবাস। দম বন্ধ হয়ে আসে সে-গন্ধ কিছুক্ষণ নাকে গেলে।

দূর থেকে গাছটাকে দেখতে পেয়েছিলেন প্রভাস ঘোষ।

মোটে একটা গাছ। বুড়ো গাছ। ডালপালা অনেক। পাতা নেই বললেই হয়। নতুন গজাচ্ছে দু-এক মুঠো। কচি, কাঁচা মাংসের রঙ। ফুলভারে নুয়ে পড়েছে। কাঁচা-সোনা রঙের ফুল—লম্বা লম্বা স্তবক—ঝুলছে গাছটার সর্বাঙ্গ বেয়ে। কেউ বলে—সোনামুঠি। কেউ বলে—হলুদথুপি। দাঁড়িয়ে আছে যেন সোণালী বর্ম-শিরস্ত্রানধারী অনড়, কর্তব্যনিষ্ঠ এক মরু-প্রহরী।

ছায়া যা একটু ঐ গাছটারই তলায়। রক্তমরুর স্বর্ণ মালঞ্চ।

ধুঁকতে ধুঁকতে গাছটার তলায় এসে দাঁড়ালেন প্রভাস ঘোষ।

গাছটার গোড়ায় একে একে তিনি নামিয়ে রাখলেন ডানহাতের শতরঞ্চি জড়ানো দড়ি-বাঁধা বেডিং আর বাঁ হাতের নাতি-বৃহৎ টিনের রঙচটা সুটকেশটা। কাধ থেকে নামালেন মোটা ঝোলা ব্যাগটা।

কোঁচার খুঁটে ঘাম চক্‌চক্ মুখখানা মুছে নিলেন। কাপড়ে ছোপ উঠে এলো গৈরিক ঘামের।

ধপ করে এবার তিনি বসে পড়লেন তপ্ত মাঠের ওপর বেডিংটাকে কাছে টেনে নিয়ে তার ওপর ভর দিয়ে ক্লান্ত, অবসন্ন দেহটাকে প্রভাস ঘোষ এলিয়ে ছড়িয়ে দিলেন গুঁড়িটায় মাথার ঠেশ দিয়ে।

আহ্!

একটা স্বস্তির শ্বাস বার হয়ে এলো তাঁর মুখ দিয়ে। পরমতম এক পরিতৃপ্তির যেন অমৃত আস্বাদ।

ওপর থেকে মোটাসোটা স্বাস্থ্যবান দেখতে হলে কী হয় : বয়েস হয়েছে বৈকি প্রভাস ঘোষের। ষাটের কাছাকাছি। সকাল থেকে পেটেও প্রায় কিছু পড়েনি। শুধু এক পেয়ালা চা আর দুটো ফুলুরি।

সারাটা রাত কাল জেগে কেটেছে। তার ওপর ভোর থেকে সুরু হয়েছে এই হাঁটা পাড়ি। মাঠের পর মাঠ। একা। তা হাঁটাও বড় কম হয়নি। কোশ ছয়েক তো হবেই। তার ওপর এই রোদ! মানুষের শরীর তো!

একাই ফিরতে হচ্ছে প্রভাষ ঘোষকে।

এই পথ দিয়ে ঐ দু'কোশ দূরের কাজল গাঁয়ে দলবল-সমেত গরুর-গাড়িতে মাত্র তিনদিন আগে যখন ওঁরা গিয়েছিলেন, তখন কিন্তু স্বপ্নেও ভাবেননি প্রভাস ঘোষ যে এত শীগগির আবার এইপথ একা হেঁটে পাড়ি দিয়ে তাঁকে ফিরে আসতে হবে।

বরং মনে তখন ছিল তার অনেক আশা। মুছে গেছে সে সবও। প্রভাস ঘোষ ফিরছেন নিঃস্ব, নিঃসহায়, সর্বহারা হয়ে।

ওরা—দলের যারা রয়ে গেল পিছনের ঐ কাজলগাঁয়ে—ফেরার কথা যারা ভাবতেও পারে না শুধু সামনে আগিয়ে চলার সাদর হাতছানিতে—তারা এতক্ষণ কী করছে?···

খাচ্ছে ?

না, খাওয়া হয়ে গেল। ঘুমোচ্ছে হয়তো রাত জাগা চোখে খোড়োঘরের মিষ্টি ছায়ায় নিশ্চিন্ত প্রশান্ত পরিতৃপ্তিতে।

বুক ঠেলে প্রভাস ঘোষের বার হয়ে আসে একটা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস। বঞ্চিতের নিঃশব্দ হাহাকার।

নাঃ, ওদের সঙ্গে প্রভাস ঘোষের আজ অনেক—অনেক তফাত। যে-তফাৎ গতরাত আর এই দুপুরে। যে-তফাৎ সুরু আর শেষে, মরু আর মালঞ্চে, জোয়ার আর ভাঁটায়।···

একটা বিড়ি ধরালেন প্রভাস ঘোষ। আর একটা মোটে পড়ে রইল পকেটে। শেষ পুঁজি। তার পরেই পুঁজি শেষ।···

মাত্র তিনদিন আগে যে-দলের সঙ্গে প্রভাস ঘোষ এই পথ বেয়েই কাজল গাঁয়ে ঢুকলেন, তা নয় কোনও শিকারীদল। তীর্থযাত্রীদলও নয়। সেবাদলও নয়।

নেহাৎই যাত্রাদল। কোলকাতার "দি নিউ রয়েল অন্নপূর্ণা অপেরা পার্টি"।

অনেককালের পুরোনো দল। প্রভাস ঘোষের চেয়েও পুরোনো। প্রভাস ঘোষের জীবন-মধ্যাহ্নে তিনি নিজেও বহুকাল অভিনয় করে ছিলেন এই দলে। তার দৌলতে সেই কটা বছর তৎকালীন অধি-কারী মালাধর মল্লিকের বাড়ি হয়েছিল, গাড়ি হয়েছিল (অবিশ্যি ঘোড়ার গাড়ি), হয়েছিল বোল্ বোলাও। আর হয়েছিল গৃহের বাইরেও তার দুটি বারো-মেসে বার-গৃহিনী।···

সেটা ছিল প্রভাস ঘোষের জীবনের স্বর্ণযুগ।

জুড়ি ছিল না তাঁর তখন যাত্রাজগতে। খেতাব মিলেছিল—নটদিবাকর! যেমন ছিল চেহারা, তেমনি খ্যাতি, তেমনি রোজগার। তখনকার বাজারেই তাঁর মাস মাইনে উঠেছিল ছ'শো টাকায়। তাছাড়া "সেলামী" বা এক দল থেকে অন্য দলে যোগ দিয়ে কৃতার্থ

করার নজরাণা বাবদ যে কোনও অধিকারী তাকে গুনে দিত কম করেও একটি হাজার টাকা।

তার ওপর আরো ছিল।

প্রত্যহ জলপানি-বাবদ সাতসিকে, তিনপ্যাকেট ট্যাটলারসিগ্রেট, ধোপা, নাপিত নিখরচায়, মাসে দুখানা ভিনোলিয়া হোয়াইট রোজ। ফাইফরমাস খাটার জন্যে হুকুমের অপেক্ষায় হাতের কাছে সদাই তটস্থ হয়ে থাকতো দু-দুটো ছোকরা চাকর। পথে বার হলে অধিকারীকে করতে হোত তার জন্যে চলাফেরা থাকার শ্রেষ্ঠতম আয়োজন। এক পা হেঁটে চলতেন না প্রভাস ঘোষ।

আর খাওয়া?...

তার জন্যে সহর থেকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হোত সরু বাসমতি চাল, সোনামুগের ডাল, গাওয়া ঘী, মাখন, ফুলকপি, কড়াইশুটি, নৈনিতাল আলু, পাঁপর, মোরব্বা। দলের সঙ্গে সঙ্গে তার জন্যে ফিরতো মাটির কলসীতে-জিয়ানো কই-মাগুর।

মদ?...

দলে আর গাঁয়ে গাঁয়ে রাজ্যির উপাসক খোসামোদ করতো দামী "খাঁটির" বোতল নিয়ে। দয়া করে কারও বোতল থেকে এক চুমুক পান করলে নিজেকে সে মহাভাগ্যবান মনে করতো, আর বোতলে অবশিষ্টাংশটুকু সম্মান পেত মহাপ্রসাদের।...

যাত্রাদলের ইতিহাসে এমন মহামানী আর মহামূল্যবান মানুষ আর আসেনি।

সেই প্রভাস ঘোষ হতমান দলচ্যুত হয়ে চৈত্রের খররোদে হেঁটে ফিরছেন ছ-কোশ মাঠ পাড়ি দিয়ে।

স্টেশনে পৌঁছতে বাকি এখনো আড়াই কোশ। পথে পড়বে দামোদর আর তার তপ্ত বালিচড়া। তাও পার হতে হবে নটদিবাকর প্রভাস ঘোষকে পায়ে হেঁটে—এই বোঁচকা-বিছানা সুটকেশ নিজেই

ঘাড়ে বয়ে।

সেই নটদিবাকর প্রভাস ঘোষ। কাল রাতে...

ভাবতেও শিউরে ওঠেন প্রভাস ঘোষ। আপনা হতেই সভয়ে তাঁর চোখ বুজে আসে। ভয় পান যেন স্মৃতিকেও।

অবাক কাণ্ড।

চোখ বন্ধ হতেই স্মৃতি আর বিস্মৃতির বন্ধ আগল ঠেলে বার হয়ে এলো পিছনে-ফেলে-আসা দিনগুলোর চেনা জানা যতকিছু। ছেঁকে ধরলো তারা।

সশঙ্কে বন্ধ চোখ খুলে ফেললেন নটদিবাকর।

ধোঁয়া। বিড়ির ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে পাক খাচ্ছে তাঁর অতীত, তাঁর ইতিহাস। কত ছবি, কত কথা, কত কাহিনী।

কী হবে ও-স্বপ্ন দেখে? কবরের মানুষ যদি কোনদিন দেখাই দেয়, তবু সে সত্যি নয়। সত্যি হয়েও আজ যেমন মিথ্যে হয়ে গেছেন—সরে গেছেন—সেদিনের সেই প্রখ্যাত নট-দিবাকর প্রভাস ঘোষ। পড়ে আছে শুধু তার পঙ্কিল প্রেতাত্মাটুকু।

হয়তো তাই হয়! তাই হয়তো রেওয়াজ এ-রাজ্যের।

এই মেকির দুনিয়ায় কিছু থাকে না সত্যি হয়ে। রাতে ডে-লাইটের আলোয় যে ছিল ত্রিভুবন ত্রাস রাজা দশানন, দিনের আলোয় রঙ-পোষাকের বাইরে সেই সত্যিমানুষটাও মিথ্যে হয়ে যায় দর্শকের নগ্ন চোখে। যা সত্যি, যা সত্যস্বরূপ, তাও অবিশ্বাস্য অলীক ঠেকে ওদের রোমাঞ্চ মানসে।

তাই হয়তো তেমনি করেই নিত্যরাতের মিথ্যা অভিনয়ে সত্যি কারের নটদিবাকরও মিথ্যে, মেকি হয়ে গেছেন সবার কাছে। তার নিজের কাছেও। তাঁর অস্তিত্ব, তাঁর সুনাম, সম্মান, উপার্জন, ইতিহাস—সব উবে গেছে। কিছু নেই আজ! কিচ্ছু না।

তাইতো মহামানী, মহাপ্রতিভ প্রভাস ঘোষ আজ নিঃস্ব রিক্ত, সর্বহারা—অপমৃত।...

কুক্‌…কুক্‌…কুক্‌…

চম্‌কে মুখ তুলে তাকালেন প্রভাস ঘোষ।

একটা অচেনা পাখি এসে বসেছে মাথার কাছে হাতখানেক ওপরেই একটা ডালে। সোনালী আর সবুজের সূক্ষ্ম কারুকাজ তার সারা দেহে। ডাকছে।

কুক্‌… কুক্‌…কুক্‌…

বসন্ত দূত। মধুমাস এসেছে মাটির ছুনিয়ায়। গাছভরা ফুলে ফুলে মধু। পাখির মধুকণ্ঠে তার মধুবন্দনা। মধুঋতু। কিন্তু…

মধুহীন প্রভাস ঘোষের জন্যে নয় এ-মধুমাস। বসন্ত আসেনি তাঁর জন্যে।

প্রভাস ঘোষ আজ বিগত-বসন্ত। বাসি। পুরানো। ফুল তাঁরও একদিন ফুটেছিল, সেই কতদিন, কতযুগ আগে। আজ তাঁর ফুল ঝরার পালা। বসন্ত যাদের—ফুলে ফুলে মধুময় আজ যাদের জীবন ঋতু, তারা আছে অন্যখানে—ঐ কাজল গাঁয়ে। প্রভাস ঘোষ তাদের কেউ নন। তাইতো গতরাত থেকে ওদের মধ্যে প্রভাস ঘোষের আর ঠাঁই হয়নি। তাইতো প্রভাস ঘোষ আজ একা—এক ঘরে। তাইতো ওরা আছে গ্রাম লক্ষ্মীর স্নেহচ্ছায়ে, আর প্রভাস ঘোষ এই খাঁ খাঁ মরু-প্রান্তরে।…

দল থেকে ছেঁটে দিয়েছে ওরা প্রভাস ঘোষকে কালরাতে।

বোঝাপড়া, হিসেব-নিকেশ তাঁর শেষ হয়ে গেছে ওদের সঙ্গে। জীবনের সঙ্গেও। যাত্রাদলের হিসাবখাতায় প্রভাস ঘোষ আজ শুধু একটা বাজেখরচ—মূল্যহীন একমুঠো অনাবশ্যক উদ্বৃত্ত।…

বছর তিনেক যাবৎ 'বসৃতি' যাচ্ছিল প্রভাস ঘোষের।

ডাকতো না কেউ। কতো দলে নিজে তিনি গিয়েছিলেন উপযাচক হয়ে উমেদারি করতে। বরাতে জুটেছিল শুধু শুকনো মৌখিক অনুকম্পা। নখদন্তগর্জনহীন বৃদ্ধ পশুরাজকে দেখে অবাক

হয়েছে অনেকে। অযাচিত উপদেশও দিয়েছে অনেকে। উপকার করেনি কেউ।

নতুন যুগে নতুন মানুষের চাহিদা। হাওয়া পাল্‌টে গেছে। প্রয়োজন ফুরিয়েছে বৃদ্ধ বটের।

তিনি শুধু আজ কৌতুক আর কৌতূহলের উপাদান।

প্রয়োজন ফুরিয়েছে, ফুরিয়েছে প্রভাস ঘোষের সবকিছু পুঁজি। ফুরোয়নি শুধু পেটের মধ্যে আদিম বন্য জানোয়ারটার পাশব দাবি। তাগাদায় তাগাদায় অস্থির উত্যক্ত করে তোলে ঘড়ি ঘড়ি।

ক্ষিদে। দুর্বার। দুঃসহ ক্ষিদে।

আপনা হতেই এক চিম্‌টি হাসি ফুঠে ওঠে প্রভাস ঘোষের ঠোঁটের কোণে।

ক্ষিদে আছে। খাবার কেনার সামর্থ নেই। খাবার খাওয়ার মূল যন্ত্রটাও বিকল হয়ে গেছে প্রভাস ঘোষের। দাঁত নেই। সেইটাই তো হয়েছে তাঁর সবচেয়ে বড় কাল। অন্ততঃ দাঁত থাকলে গতরাতে অমনভাবে তাঁকে দল থেকে বিদায় নিতে হোত না।

তবু ক্ষিদে আছে। অতীত দিনের প্রভাস ঘোষের ঐ একটা লক্ষণই পড়ে আছে।

আর রয়ে গেছে একটা বদভ্যাস। নেশা।

ধাপে ধাপে নটদিবাকর নেমেছেন অনেকদূর। "খাঁটি" থেকে প্রথমে "কাঁচি"। তা থেকে তাড়ি। তাড়ি থেকে গাঁজা আর আফিংয়ে। ক্রমে গাঁজাটাও ছাড়তে হয়েছে। আছে শুধু আফিং। আফিং ছাড়া মোটেই চলে না। দিনে অন্ততঃ চার আনার। এদিকে সিগ্রেট গিয়ে হয়েছে বিড়ি। তাও জোটে না। কদিন গান ছিল। দল থেকেই চিরাচরিত বাঁধা নিয়মমাফিক আর সবার মতন নটদিবাকরও "মুখশুদ্ধি" পেয়েছিলেন গোটাকয়েক করে বিড়ি। নটদিবাকরের বিশেষ সম্মানী সিগ্রেট আর কেউ দেয় না। সেই বিড়িরই আর মোটে একটা পড়ে আছে পকেটে। আফিং তো আর

ওভাবে পাওয়া যাবে না।

বিশ্রী বদনেশা এই আফিং। একবার ধরলে ছাড়ার আর উপায় নেই। ঘড়ির কাঁটা ধরে রোজ ঠিক সময়ে গালে পড়া চাই-ই। না পেলে মানুষ অবিশ্যি মরে না। দুর্ভোগ আর যাতনা যা হয়, তা কিন্তু মরণেরও বাড়া।

মানসম্ভ্রম অনেক আগেই গেছে নটদিবাকরের। যতটুকু আমিত্ববোধ পড়েছিল—ক্ষিদে যা কোনদিন ক্ষয় করতে পারতো না—তাও গেছে আফিংয়ের নেশায়। জুচ্চরি মিছেকথা, ধার, ভিক্ষে—কিছুই বাকি থাকেনি। 'কালোমানিকের' প্রেমে লাজ-কুল-মান সবকিছু জলাঞ্জলি গেছে।

কালরাতের ঘটনাটা ঘটলো শুধু ফোকলা মুখ আর আফিংয়ের নেশার ষড়যন্ত্রে!

যে-নটদিবাকরকে ইদানিং আর ডাকত না কেউ, ক'বছর বাদে সেই তাঁকেই দয়া করে ঠাঁই দিয়েছিল এই 'দি নিউ রয়েল অন্নপূর্ণা অপেরা পার্টি'। কেন যে ঠাঁই দিয়েছিল, তাও অবিশ্যি প্রভাস ঘোষের অজানা নয়। রাঢ় প্রদেশের স্থানে স্থানে আজও একদল লোক তাঁর নামটাকে ভোলেনি। বিগত দিনের দিকপাল যাত্রাভিনেতা নটদিবাকর প্রভাস ঘোষ সম্পর্কে আজও তাদের শ্রদ্ধা আর স্বপ্ন ফিকে হয়ে যায়নি। হয়তো অনেকদিন দেখেনি বলেই তাদের স্মৃতি-পটে সেদিনের সেই প্রখ্যাত প্রভাস ঘোষের ছবির রঙটা চটে যায়নি।

গাজনের 'খেপে'—'দি নিউ রয়েল অন্নপূর্ণ অপেরা পার্টি' পাড়ি জমিয়েছে এই পথে।

এধারের গাঁয়ে গাঁয়ে সারা চৈত্রমাস ধরে চলে ধর্মরাজতলার বারোয়ারি গাজন-উৎসব। উৎসবের অন্যতম প্রধান অঙ্গ হোল যাত্রাগান।

নতুন অধিকারী-অভিনেতা অচিনকুমার দল হাতে পেয়েই কম খরচে বেশি লাভের লোভে কজন বেশি দরের অভিনেতাকে ছাড়িয়ে দিয়ে প্রভাস ঘোষকে দলে নিয়েছিল নামমাত্র দক্ষিণায়। ভেবেছিল —এ-অঞ্চলে নটদিবাকরের সুনাম ভাঙিয়েই কটি মাস দল চালিয়ে লাভের ঝুলিটা ভারি করে নেবে।

দক্ষিণা অত্যন্ত কম হলেও রাজি হয়েছিলেন প্রভাস ঘোষ। না হয়ে উপায়ও ছিল না। আর হপ্তাখানেক তাঁকে বেকার থাকতে হলে অনাহারে অপমৃত্যু ছিল তাঁর অনিবার্য ভবিষ্যৎ। তাই অমন অপমানকর দক্ষিণার চাকরিও তিনি সাগ্রহে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

আর একটা আশাও ছিল তাঁর মনে।

অভিনেতার পক্ষে—যেখানকারই অভিনেতা হোক—দর্শক-চোখে অদর্শন মানেই দর্শক-মানসে তার অপমৃত্যু। প্রভাস ঘোষের অবস্থাও প্রায় তাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমন সময়ে এই অপ্রত্যাশিত আহ্বান। অকূলে কূল পেলেন প্রভাস ঘোষ' স্থির করলেন, কিছুদিন নিয়মিত অভিনয়ের পর হারানো সুনামটুকু তাঁর সব না হোক—তাঁর অস্তিত্বটুকু সম্পর্কে যাত্রাদর্শকদের সচেতন করে তুলেই তিনি অন্যদলে যোগ দেবেন। অন্যদলে তখন অপেক্ষাকৃত সাদর আর উচ্চ-দক্ষিণার আহ্বান দুর্লভ হবে না।

হিসেবে ভুল হয়ে গিয়েছিল দু' পক্ষেরই। নবীন অধিকারী আর প্রাচীন অভিনেতা দুজনেরই।

ভুলটা বিশেষভাবে ধরা পড়তে সুরু করলো দিনদশেক আগে এ-অঞ্চলে প্রথম অভিনয়ের রাত থেকেই। দেখা গেল, দর্শকরা আর শুধু লেবেলে খুশি হতে রাজি নয়। প্রভাস ঘোষকে দেখে ঘটলো তাদের কল্পস্বর্গচ্যুতি। আসরেই তা জানিয়ে দিতে তারা কসুর করলো না।

নায়েকরা ধেয়ে এলো আসর ছেড়ে সাজঘরে। শুনিয়ে গেল

অধিকারীকে চোখা চোখা বাক্যবাণ। কোথাও প্রভাস ঘোষের সামনেই, কোথাও বা আড়ালে। আড়ালে বললেও, কথাগুলো প্রভাস ঘোষের কাণে এলো ঠিকই। পৌঁছে দিল অচিনকুমার নিজেই—শানিয়ে, বিঁধিয়ে। মরমে মরে গেছেন প্রভাস ঘোষ প্রতিবারই। তবু মুখ বুজে সহ্য করেছেন। নিরুপায়।

সটান অবাকও হয়েছেন প্রভাস ঘোষ।

আশ্চর্য! এত শীগগির এমনভাবে মানুষগুলো বদলে গেল কী করে?···কবে বদলালো?···

ক'খানা তো সেই একই পালা। সে-ই প্রভাস ঘোষ। সেই একই ধারায় তাঁর অভিনয়। বয়েসটা অবিশ্যি তাঁর অনেক বেড়েছে। মেক্-আপে তা ঢাকা দিতেও তো তিনি কসুর করেন না। কণ্ঠ তাঁর আজো আছে তেমনি উদাত্ত। দমটা একটু কমে গেছে বটে। দাঁত গিয়ে উচ্চারণ-অনুপ্রাসে ত্রুটিও যে মাঝে মাঝে ঘটে না, তাও নয়। কিন্তু মাত্র ঐটুকুতে তাঁর সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে? ঐ সামান্য খুঁতে স্বপ্নভ্রষ্ট হবে দর্শকরা? মনোসিংহাসনে এত দিনের সুপ্রতিষ্ঠিত সম্রাটকে ঐ সামান্য অপরাধে ওরা এমনিভাবে করবে গদিচ্যুত?···

আশ্চর্য, আশ্চর্য মানুষের মন! আশ্চর্য তাদের মতিগতি আর রুচি!

ঐ তো দলের মস্ত অভিনেতা অচিনকুমার নিজে। কী যে ঢংয়ের এ্যাক্টিংয়ের ছিরি। না আছে গলা, না আছে পুরুষালি বিক্রম। মিনমিন করছে। হাতপা বেঁকিয়ে ও কী সব বায়োস্কপে ঢংয়ের আর্ট আর পশ্চার! আগেকার দিন হলে ঐ কেরামতিতে কাটা সৈনিকের পার্টও জুটতো না ওর অদৃষ্টে। অথচ ওরাই আজ গণ্যমান্য রথারথী। আসরে বার হতে না হতেই হাততালির ঝড়বৃষ্টি বয়ে যায়। সেই দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না। যত সব···

কাজল গাঁয়ে পৌঁছেই প্রভাস ঘোষকে সাবধান করে দিয়েছিল অচিনকুমার।

সবার সামনেই শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছিল ঃ খুব সাবধানে এখানে মাস্টার মশাই !

আজো প্রভাস ঘোষকে দলের লোকে প্রকাশ্যে 'মাস্টার মশাই' বলে খাতির করে। প্রভাস ঘোষ কিন্তু প্রতিবারই শিউরে শিটিয়ে উঠেছেন ঐ-ডাক কাণে গেলেই। মনে হয়, প্রকাশ্য খাতিরের ছলে ঐ বলে সবাই যেন তাঁকে ইচ্ছাকৃত ঠাট্টা করে ভিতরে ভিতরে নিজেদের মধ্যে মজার খোরাক পায়।

শিউরে উঠেছিলেন প্রভাস ঘোষ। ইঙ্গিতটা বুঝতে তাঁর দেরি হয়নি।

বলেছিলেন : চেষ্টার আমি কসুর করবো না।

আশ্বাসে সন্তুষ্ট হ'তে পারেনি অচিনকুমার।

আবার বলেছিল ঃ শুধু নিজের জন্যে চেষ্টা করতে আপনাকে বলছিনা মাস্টার-মশাই। চেষ্টা করবেন, যাতে একার জন্য চল্লিশটা লোকের মেহনৎ আর অন্ন মারা না যায়। বুঝলেন ?

মুখে জবাব দিতে পারেননি প্রভাস ঘোষ। ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিলেন তিনি।

তারপরেও অচিনকুমার আবার ছোবল কেটেছিল ঃ ঢুক করে ঘাড় নাড়তে কষ্ট হয় না মাস্টার মশাই। কষ্ট হয় গানে মার খেয়ে করকরে টাকা সবাইকে গুনে দিতে। কষ্ট হয়, বায়না জোগাড় করতে। এখানেও যদি ঐ বেতো ঘোড়ার খেল দেখান, ব্যস একটি পয়সাও না দিয়ে রাতের বেলাতেই বিদেয় করে দোব। এখানকার চারদিনের বায়না তো যাবেই ওকম্মো হয়ে, পরের আট-দশ পালাও ঐ রিপোর্টে ক্যানসেল। মনে থাকে যেন।

মনে মনে মৃত্যুকামনা করেছিলেন প্রভাস ঘোষ।

বেতো ঘোড়া !

নিচু ঘাড় উঁচু করে তিনি তাকাতে পর্যন্ত পারেননি। চোখে না দেখলেও, কানে তাঁর ঠিক এসে পৌছেছিল সব্বার খুকখুকে চাপা হাসি।

বেতো ঘোড়া !···

সাজঘরে যাওয়ার ঠিক আগে নিজের আস্তানায় কৌটো খুলে আফিংয়ের বড়িটি গালে ফেলেছিলেন প্রভাস ঘোষ। ঘরে এসে ঢুকল আবার অচিনকুমার।

বিরূপকণ্ঠে বলে উঠলো : খাচ্ছেন তো ঐ ছাইপাঁশগুলো ? নাঃ, আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না। এতো করে মানা করি, কিচ্ছুতে যদি আপনার ঐ উঞ্জো স্বভাব পাল্টায় !

বেরোবার মুখেই বাধা।

আশু অমঙ্গলের আশঙ্কায় শিউরে উঠলেন প্রভাস ঘোষ। যাত্রা-দলের চিরন্তন সংস্কার।

প্রকাশ্যে আশ্বাস দিতে মিনমিন করে শুধু বললেন : না না, ও কিছু না। কিচ্ছু হবে না।

: আর হবে না। হচ্ছে তো রোজই। বুড়ো হলে সত্যিই দেখি মানুষ জানোয়ার হয়ে যায় !

গজগজ করতে করতে ঘর থেকে বার হয়ে গেল অচিনকুমার।

পা-দুটো প্রভাস ঘোষের হঠাৎ যেন পাথর হয়ে গেল।

জানোয়ার !···

সে-রাতের অভিনয়ে প্রভাস ঘোষের ছিল ছোট্ট একটা পার্ট।

ঐতিহাসিক পালা। মাঝামাঝি তাঁর দু' সিনের পার্ট। প্রথম রাতেই যাতে বায়নাটা ভেস্তে না যায়, তাই বোধহয় বুদ্ধি করে অচিন কুমার সে-রাতের জন্যে ঐ পালাটাই ঠিক করেছিল।

অনেকক্ষণ থেকে অনেক যত্নে সেজেগুজে নিজের জায়গায় খোলা মেক-আপ বাক্সের সামনে বসেছিলেন প্রভাস ঘোষ। সচেতন হয়েই বসেছিলেন প্রভাস ঘোষ। চেষ্টা করছিলেন মনটাকে প্রফুল্ল রাখার জন্যে। মনে মনে আপ্রাণ চেষ্টায় নিজেকে তৈরি করছিলেন সুনামটুকু

অক্ষত রাখার জন্যে। তবু মাঝে মাঝে মুষড়ে পড়ছিল তাঁর মন। ঝিমিয়ে পড়ছিল উৎসাহ। দুটো কথা বারবার ঘুরে ঘুরে তার কাণে বাজছিল।

বেতো ঘোড়া !···

জানোয়ার !···

ভাবতে ভাবতে কখন হয়তো অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। হয়তো বা আফিংয়ের ঢুলুনিও যোগ দিয়েছিল তার মানসিক অবসাদের সঙ্গে। জেগে উঠলেন প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়ে।

ঃ আপনার সিন যে মশাই ! যান, যান—

চমকে উঠলেন প্রভাস ঘোষ।

সিন !···কী সর্বনাশ !···সিন কেন ?···

আঃ, এ আবার কী বিপদ ! নাগরাজোড়া গেল কোথায় ?

অপেক্ষা করতে পারলেন না প্রভাস ঘোষ। জুতোর গাদা থেকে তাড়াতাড়ি দুপাটি পায়ে গলিয়ে আসরে ছুটলেন তিনি হোঁচট খেতে খেতে।

এমন বিশেষ কিছু দেরি হয়নি তাঁর। তবু দর্শকদের মধ্যে তখন সুরু হয়ে গেছে মৃদু গুঞ্জন। আসরে সহ-অভিনেতাদের চোখ থেকে যে-দৃষ্টি ঝরে পড়লো তাঁকে লক্ষ্য করে, আর যাই হোক, তাকে স্বাগত-সম্ভাষ মোটেই বলা যায় না।

প্রাণপণ করে যুঝতে লাগলেন প্রভাস ঘোষ। সর্বসামর্থে আরম্ভ করলেন অভিনয়। নিমেষে ঠাণ্ডা হয়ে গেল দর্শক-গুঞ্জন। জমে উঠলো আসর।

হঠাৎ···

ওকী !···আবার কেন উঠছে হাস্যরোল ? ভালো লাগছে না প্রভাস ঘোষের অভিনয় ?···ভুল হচ্ছে কিছু ?···

অভিনয়ের মাঝেই বিভ্রান্ত জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকালেন তিনি জনৈক সহ-অভিনেতার দিকে।

চোখের ইশারা পেয়ে নিজের পায়ের দিকে তাকালেন প্রভাস ঘোষ।

কী সর্বনাশ!

তাড়াতাড়িতে এ কী কাণ্ড করেছেন তিনি? ছুটো নাগরা যে দু' রঙের। লাল আর বেগুনি।···ছি ছি!···

ভাগ্যক্রমে সিনটা তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল।

সাজঘরে ফিরে এলেন প্রভাস ঘোষ।

সবাই একবার করে তাকালো ওর দিকে। আশ্চর্য, মুখে কেউ কিছু বললো না। যাত্রার দলে আটপৌরে ইতিহাসে এ এক অভাবনীয় ব্যাপার। প্রভাস ঘোষের মনে হোল—এর চেয়ে বাক্যবাণ ছিল অনেক ভাল। ওদের চোখে ঐ নীরব চাহনি—উঃ, ওর সঙ্গে বুঝি এসে মিশেছে সৃষ্টির সবটুকু উপেক্ষা, অবহেলা, অপমান আর বিদ্রূপ। অসহ্য ও-চাহনি।

পরের সিনটায় অবশ্য কোনও ত্রুটি হোল না। অভিনয় বরং তাঁর ভালই হোল সে-দৃশ্যে। তবু থেকে থেকে খুক খুক হাসি আর দূরাগত বিদ্রূপ-ধ্বনি ভেসে আসতে লাগলো। প্রভাস ঘোষের প্রথম দৃশ্যের ত্রুটিই বিঘ্নিত করলো তার দ্বিতীয় দৃশ্যের কৃতিত্ব-টুকুকে।···

চূড়ান্ত হোল যাওয়ার সময়ে।

ঘরে ঢুকতেই ব্যস্তভাবে রাঁধুনি অনন্ত ঠাকুর ফরমাস-খাটার ছোকরাটাকে হুকুম জানালোঃ ওরে, দে দে! মহাবীর আইছেন বটে! আসনটি কর্যে দে না কেনে ধাঁ কর্যে।

আহার-রত বহুকণ্ঠে উঠলো হাসির রোল।

প্রভাস ঘোষের মাথাটা ঝুঁকে পড়লো বুকের ওপর।

আসন পেতে প্রভাস ঘোষের কিন্তু প্রায় দশমিনিট কেটে গেল।···একটা শালপাতা। আধোয়া। মিনমিন করে প্রভাস ঘোষ

ডাকলেন ঃ ঠাকুর !

ঃ আজ্ঞা, মাস্টারমশাই !

হাতজোড় করে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো অনন্ত ঠাকুর।

ঃ আর পাতা নেই ?

ঃ আজ্ঞা কেমন কর‍্যে রইবে কন মাস্টার মশাই ?—রসিয়ে রসিয়ে নিবেদন করলো অনন্ত ঠাকুর ঃ যা এ্যাক্টোটি করিছেন বটে আজ আপনারা সব মস্ত বীর-মহাবীর মিল্যে, উই শালবৃক্ষে আর পাতাটি রইল না। খস্যে খস্যে উড়ে গেছে সব।

আবার উঠলো ওধার থেকে হাসির রোল।

শেষ চেষ্টায় প্রভাস ঘোষ কোনমতে বললেন ঃ কিন্তু পাতায় খাবো কী করে ?

ত্বরিৎ জবাব দিল ঠাকুর ঃ আজ্ঞা, ই রাতটির মতন কষ্টেসৃষ্টে উইতেই চালায়্যে নেন না কেন ? কাল প্রাতঃকালটি হল্যেই অধিকারীটিরে কয়্যে আপনার তরে গঞ্জ হত্যে খাগড়াই কাঁসার ইয়া একটি বগি থালা নির্ঘাৎ আনায়্যে নিব। আর ইটাও দেখি বাপু মোদের অধিকারীটির নাহক অন্যায় ! যে মানুষটি হও খেট্যেখুট্যে নিত্যি রেতে তুমাদের চল্লিশজনার ইমন উপকারটি করিছে বটে, তারে সম্মানী বাবদ একটি থালাও কিন্যে দিত্যে পার নাই হে তুমরা ?

হাসির অট্টরোল এবার কানে তালা ধরাতে চায়। ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে প্রভাস ঘোষের কান মাথা।

খেতে খেতে ওধার থেকে সেনাপতি কেদা জিজ্ঞাসা করে ঃ ঠাকুর মাছের মুড়াটি কী হইছে ?

ঃ হাই দ্যাখ ! -যেন প্রশ্নকর্তার অজ্ঞতায় অবাক হয়ে জবাব দেয় অনন্তঠাকুর ঃ শুন কথাটি মোর সেনাপতির ! সিটা যে মোদের মাষ্টার মশাই-এর তরে রেখ্যেছি হে ! ইত মেহনতটি করিছেন আজ, তুমাদের চল্লিশটি মাথা রক্ষা করিছেন, মুড়াটি না দিল্যে ধকলটি

সইবে কেনে হে ?

সারা ঘর থরথর করে কেঁপে উঠলো হাসির দমকে।

খেতে বসে মনে মনে বারবার নিজের মৃত্যুকামনা করলেন নটদিবাকর।

তবু—সেই খাওয়া শেষ করে উঠলেনও।...

শোওয়ার ব্যাপারেও তাই।

ওধারের ঘরগুলো পাকা। ওখানে ঠাঁই জোটেনি তাঁর। সবাই ওরা আগেভাগে দখল করে নিয়েছে। অগত্যা প্রভাস ঘোষকে ঠাঁই নিতে হয়েছে একা এধারে।

ছিল গোয়ালঘর। গরুগুলোকে সরিয়ে নিয়েছে। সারা ঘরময় অম্লান চিহ্ন কিন্তু রয়ে গেছে তাদের। গোবর। খড়। গামলাভর্তি পচা জল। মশা। শ্বাসরোধকারী চাপা ভ্যাপসানি। যে ধারটা ঈষৎ ফাঁকা, সেখানে দু আঁটি খড় বিছিয়ে তার ওপর প্রভাস ঘোষ পাতলেন তাঁর ছেঁড়া সতরঞ্চির ওপর তেলচিটে ধরা বালিশটা।

আঃ!

পরম পরিতৃপ্তিতে ক্লান্ত, অবসন্ন দেহভার এলিয়ে দিলেন প্রভাস ঘোষ।

বেড়ার ফাঁক দিয়ে নজর পড়লো, রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

ওদের রাত। আর সব্বার রাত।

প্রভাস ঘোষের রাত কবে শেষ হবে গো ?...

পরদিন সারাটা দিনই সবাই তটস্থ হয়ে রইল। প্রভাস ঘোষ নিজেও।

কি হয়-কি হয় অবস্থা।

পালা হবে 'তরণীসেন বধ'। প্রভাস ঘোষকে করতে হবে পালার সব চেয়ে বড় আর শক্ত পার্ট—বিভীষণ। এককালে ঐ

পার্ট-এ তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী! এ অঞ্চলে তখন বহু জায়গায় ঐ পার্ট করে নাম কিনে গেছেন। হয়তো বা কোনদিন এই কাজল গাঁয়েও করে থাকবেন। ঠিক মনে নেই।

সেই সুনামের জন্যেই তাঁকে আবার দেখা দিতে হবে ঐ ভূমিকায়।

অথচ ভয় সবার সেই প্রভাস ঘোষকে নিয়েই। ভয় তাঁর নিজেরও।···

নামলো সন্ধ্যা।

ডাক গেল ঘরে ঘরে ঘুমকাতর মানুষগুলোর কাছে। হাজির হতে হবে সাজঘরে।

প্রভাস ঘোষকে অবিশ্যি কেউ ডাকতে গেল না। উঠলেন তিনি আপন গরজেই।

আসরে আজ নাকি জনসমাগম হয়েছে গতরাতের তিনগুণ। আশপাশের সব কখানা গাঁ ভেঙে পড়েছে।

এসেছে তারা নটদিবাকরের 'বিভীষণ' দেখতে। সেদিনের প্রভাস ঘোষের কৃতিত্বে এদিনের প্রভাস ঘোষ মনে মনে ভয় সত্ত্বেও খুসি না হয়ে পারেন না।

হাই উঠলো প্রভাস ঘোষের।

ঘুমকাতুরে হাই নয়। আফিংয়ের নেশা জানালো তার রসদের তাগাদা।

বাঁখারিতে টাঙানো জামাটার পকেটে হাত ঢোকালেন প্রভাস ঘোষ কৌটোটার জন্যে।

সাজঘরে হৈ-হৈ কাণ্ড।

প্রভাস ঘোষকে চেনা যায় না। পাগল হয়ে গেছেন যেন। খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তার আফিংয়ের কৌটো।

সবাই জানে ওটা কার কাণ্ড। প্রভাস ঘোষের নিজেরও তাই অনুমান। কথা স্বীকার তো করছেই না অচিনকুমার, উলটে ধমকাচ্ছে।

ঃ আফিং গেলা চলবে না আপনার। ঐ ছাইপাঁশ গি— গিলেই আপনি রোজ আমার সর্বনাশ করছেন।

করুণতম মিনতি জানান প্রভাস ঘোষঃ না না, ওতে কি ক্ষতি হয় না!

ঃ হয় না? কালকের কাণ্ডটা তবে কেন হয়েছিল শুনি? তখুনি বারণ করিনি আপনাকে?

ঃ একচিমটি দাও। একটুখানি।

অনুনয়ে প্রায় কেঁদে ফেলেন প্রভাস ঘোষ।

ঃ না।—দৃঢ় সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয় অচিনকুমারঃ আমার দলে থাকতে হলে ও কেলেঙ্কারি চলবে না। আফিং আপনাকে আজ খেতে দেওয়া হবে না—হবে না!···

দেওয়া হয়ও নি।

সব আকুতি প্রভাষ ঘোষের ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। কিছুতেই তিনি ওদের বোঝাতে পারেন নি যে তার সব সামর্থ্য লুকিয়ে থাকে ওই ছোট্ট কালো বড়িটির মধ্যে।

সাজতে হোল। আসরে বার হতে হোল।

'কালোমানিক' প্রতিশোধ নিতে ভুললো না। দুটো সিন শেষ হবার আগেই আসরে কান পাতা দায় হোল। যায় বুঝি যাত্রা ভেঙে।

বিভীষণ যেন কাদার তাল। প্রাণ নেই স্ফূর্তি নেই। মেজাজ নেই। পার্ট পর্যন্ত ভুল হতে লাগলো।

প্রাণপণে যুঝ তে লাগলেন প্রভাস ঘোষ। ফল হোলো বিপরীত উদ্বেগ আর আশঙ্কা যত বাড়তে লাগলো, ততই যেন বেসামাল

হয়ে পড়তে লাগলেন প্রভাস ঘোষ।

বিপদের ওপর বিপদ।

দন্তহীন ফোকলা মুখের উচ্চারণটাকে কিছুটা সামলে রাখতেন প্রভাস ঘোষ অভিনয়কালে মুখে ছোট এক ডেলা মিছরি নিয়ে। টুকরোগুলো রাখা ছিল তার আফিংয়ের কৌটোর মধ্যে। মিছরির সেই টোটকার অভাবে ভাষণও হতে লাগলো তার দুর্বোধ্য, বিকৃত।

হুলুস্থুল কাণ্ড বেধে গেল আসরে।

হাসি···ঠাট্টা···কুকুর ডাক···হাততালি···চিৎকার···

নায়েক ছুটে এলো। শাসিয়ে গেল অধিকারীকে অকথ্য ভাষায়।

তার পরেই···

সিন থেকে প্রভাস ঘোষ সাজঘরে ফিরে আসতেই ঘটে গেল কাণ্ডটা।

অচিনকুমার বললো ঃ পোষাকটা খুলে ফেলুন মাস্টারমশাই!

পোষাক খুলে ফেলো!···

অভিনেতার চরমতম শাস্তি আর অপমান। প্রভাস ঘোষ শুনেও যেন শুনতে পেলেন না কথাটা। অথবা শুনেও হয়তো বিশ্বাস করতে পারলেন না নিজের কানকে। মুখে তাঁর জোগালো না একটাও কথা। ফ্যালফ্যাল করে তিনি শুধু চেয়ে রইলেন অচিনকুমারের দিকে।

ধমকে উঠলো অচিনকুমার ঃ অমন ন্যাকার মতন চেয়ে থাকবেন না। খুলুন পোষাক!

ঃ কিন্তু কে করবে এ-পার্ট?

ঃ আমি। ইচ্ছে হয়, দেখে শিখে নিন—এ্যাকটিং কাকে বলে? আমারও যেমন! সাধ করে এক বেতো ঘোড়া পুষতে গিয়েছিলুম।

বেতো ঘোড়া!···

নট-দিবাকরকে এ্যাকটিং শিখতে হবে সেদিনের ছেলে অচিন কুমারের কাছে?···

এই কথা ঐ অত লোকের মাঝে অচিনকুমার তাঁকে বলতে পারলো ?···

এগিয়ে এলো বেশকারী চিনিবাস তার সাজ খুলে নিতে। গায়ে হাত পড়লো।

ঠিক সেই মুহূর্তে প্রভাস ঘোষের সিটে বসে তাঁরই মেক-আপ বাস্ক থেকে রঙ চড়াতে চড়াতে অচিনকুমার বলে উঠলো ঃ কাল সকালে উঠেই আপনার পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে নিয়ে ফিরে যাবেন। আমার এটা ধর্মশালাও নয়, পিঁজরেপোলও নয়। বেতো ঘোড়া পোষার সখ আমার মিটে গেছে।

বেতো ঘোড়া !···

একটু আটকালো না অচিনকুমারের মুখে ?···

কুক্ ··কুক্···কুক্···

চমকে যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলেন প্রভাস ঘোষ। ব্যাহত হোল চিন্তাসূত্র।

পাখিটা এখনও ডাকছে।

বসে আছে সেই একই জায়গায়। ডাকছে, না অজানা ভাষায় ও-ও ঠাট্টা করছে বেতোঘোড়া নটদিবাকরকে ?

বেতোঘোড়া !···

কী করে অচিনকুমার ঐ কথাগুলো বলতে পারলো প্রভাস ঘোষকে ?

আজ বড় হয়েছে, টাকা হয়েছে, মালিক সেজেছে দলের। সেদিনের সেই এ্যাত্তোটুকু নাচিয়ে ছোঁড়া হারাণ আজ নাম ভাঁড়িয়ে হয়েছে অচিনকুমার। কিন্তু হয়েছে কী করে ? কার দয়ায় হারাণ আজ বড় এ্যাক্টর অচিনকুমার ? ভুলে গেছে সে সব ইতিহাস ?···

নাচতো আর ফরমাস খাটতো ঐ হারাণে সেদিন।

হাঁ। এই "দি নিউ রয়েল অন্নপূর্ণা অপেরা পার্টিতেই"। ছিল এই প্রভাস ঘোষেরই খাশ ছোকরা। বিছানা পাড়তো, বিছানা বাঁধতো, তেল মাখিয়ে দিত, পা টিপতো। কতই বা বয়েস তখন ওর? বড়জোর দশ।

নাঃ, প্রভাস ঘোষের আর যত দোষই থাক, যাত্রাদলের ক্লেদাক্ত উপসর্গ কোনদিন ছিল না। হারাণেকে তিনি সত্যিই ভালোবাসতেন।

হারাণের ভালই করেছিলেন প্রভাস ঘোষ। তিনিই ওকে প্রথম দিয়েছিলেন চরিত্রাভিনয়ের সুযোগ।

এমনি কোন এক গাঁয়ে···

পালা হবে "হরিশ্চন্দ্র"।

রোহিতাশ্বের পার্ট করতো যে-ছোকরা, হঠাৎ তার সর্বাঙ্গে হাম বেরুলো।

উপায়?

ম্যানেজার খাড়া করতে চাইল অন্য একটা ছোকরাকে কোনরকম জোড়াতালি দিয়ে। সবার বাধা অগ্রাহ্য করে সেই আসরে প্রভাস ঘোষই হারাণে-কে বার করেছিলেন রোহিতাশ্ব করে।

তারপর থেকেই হারাণের প্রমোশন ঘটলো নাচিয়ে থেকে বালক-অভিনেতায়। সেবার যতদিন ওদলে ছিলেন প্রভাস ঘোষ, নিজে তিনি তালিম দিয়ে তৈরি করে হারাণেকে নানান পার্টে নামিয়ে ছিলেন। সেই হারাণই আজ সেই দলের অধিকারী হয়ে সেই প্রভাস ঘোষকেই কিনা···

আচ্ছা, সেটা কোন্ গাঁ যেখানে তিনি প্রথম রোহিতাশ্ব সাজিয়েছিলেন হারাণেকে?···কোন্ গাঁ?···কোন্ জেলায়?···কেন মনে পড়ছে না?···

কুক্···কুক্···কুক্···

আবার ডাকছে পাখিটা।

চোখ তুলে একদৃষ্টে পাখিটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলেন সেই ভুলে-যাওয়া গাঁয়ের নামটা।

হঠাৎ চমকে উঠলেন প্রভাস ঘোষ।

ধড়মড় করে দাঁড়িয়ে উঠে দেখতে লাগলেন গাছটার গায়ে এক-জায়গায় একটা দাগ।

পাখিটা ভয় পেয়ে উড়ে গেল।

কাটা দাগ। অনেকদিন—ঐখানটায় ছুরি দিয়ে কেটে কেটে কী যেন কে লিখে রেখেছে। ডালটা শুকিয়ে গেছে। লেখাটা আরও স্পষ্ট হয়েছে।

সর্বাঙ্গে একটা বিদ্যুৎ শিহরণ খেলে গেল প্রভাস ঘোষের।

মনে পড়েছে। স্পষ্ট মনে পড়েছে সব কথা। হাঁ, এই গাঁয়েই—এই কাজল-গাঁয়েই হারাণেকে তিনি প্রথম সুযোগ দিয়েছিলেন। আশ্চর্য যোগাযোগ!

ঠিক এমনি দুপুরে সেদিনও দলটা পাড়ি দিচ্ছিল এই মাঠ। সবাই হেঁটে। শুধু নটদিবাকরের জন্যেই নায়েকরা পাঠিয়েছিল একটা টাট্টু ঘোড়া। তার সম্মানী। ঘোড়ায় চড়ে মাঠ পার হচ্ছিলেন প্রভাস ঘোষ। পাশে পাশে খোলা একটা ছাতা হাতে নিয়ে প্রভাস ঘোষের মাথায় ধরে হাঁটছিল হারাণে।

ক্লান্ত দল বিশ্রাম করতে বসেছিল।

এই গাছতলাতেই ঠাঁই নিয়েছিলেন প্রভাস ঘোষ। হারাণে বাতাস করছিল, পা টিপে দিচ্ছিল। নেহাৎ বাচ্চা তখন। খেলাচ্ছলে সে-ই তখন ছুরি দিয়ে ঐ গাছের ডালে খোদাই করে রেখেছিল প্রভাস ঘোষের নামের পাশে নিজেরও নামের আদ্যাক্ষর।

সেই গাঁ আজো রয়েছে। রয়েছে সেই মাঠ। সেই গাছ। সেই হারাণে। আর সেই প্রভাস ঘোষও। সবই আছে। শুধু চাকা ঘুরে গেছে। উপরের জল নিচে নেমেছে, আর নিচের জল

উঠেছে ওপরে। হারাণে হয়েছে অভিনেতা-অধিকারী অচিনকুমার। আর নটদিবাকর প্রভাস ঘোষ হয়েছেন এক অনাবশ্যক জঞ্জাল। বেতোঘোড়া।

নেমকহারাম! ছুনিয়া নেমকহারাম! ঐ কাজল গাঁয়ের সব্বাই, ঐ অচিনকুমার,—সব্বাই বেইমান। তা নাহলে এমন ব্যবহার ওরা আজ প্রভাস ঘোষের সঙ্গে করতে পারে? বলতে পারে তাঁকে অমন কথা? তার নিজের হাতে তৈরি ঐ অচিনকুমার —তাঁর সৃষ্টি···

কুক্···কুক্ · কুক্···

আবার এসে বসেছে পাখিটা। ঠিক একই জায়গায়। ঠোকরাচ্ছে খোদইটার উপর।

খোদাই-এর ডান পাশের প্রশাখাটা শুখিয়ে গেছে। কিন্তু কী আশ্চর্য! শুক্‌নো প্রশাখাটার সন্ধিস্থান থেকে বার হয়েছে আর একটা প্রশাখা। সেটা সবুজ, সতেজ, পুষ্পভারাবণত। প্রায় ঢেকে ফেলেছে শুকনো প্রশাখাটাকে। আর হয়তো একটা বছরের মধ্যেই পুরোপুরি ঢেকে ফেলবে।

অত ছুঃখের মধ্যেও প্রভাস ঘোষের ঠোঁটের আড়ালে একচিমটি দার্শনিক হাসি উঁকি দিতে চাইল।

ঐ প্রাশাখা ছুটো—ঠিক যেন ওদেরই প্রতীক। শুকনোটা নট-দিবাকর। সবুজটা অচিনকুমার। ঠিক অমনি ভাবেই আর হয়তো এক বছরের মধ্যেই প্রভাস ঘোষের নিজেরই সৃষ্টি অচিনকুমার তাঁকে নিশ্চিহ্নে গ্রাস করে ফেলবে।

আচ্ছা, কেন এমন হয়? স্রষ্টাকে গ্রাস করে ফেলবে তার সৃষ্টি? একটু মমতাও হয় না? ছুঃখও নয়? কৃতজ্ঞতাটুকুও না?

প্রভাস ঘোষও কি কোনদিন তাঁর স্রষ্টাকে এমনিভাবে···

চমকে শিউরে উঠলেন প্রভাস ঘোষ।

হাঁ হাঁ, তিনিও। প্রভাস ঘোষ যাঁর সৃষ্টি, যাঁর অকুণ্ঠ স্নেহ তাঁর

যতকিছু সুযোগ, সম্মান আর প্রতিষ্ঠার কারণ,—সেকালের এই "দি নিউ রয়েল অন্নপূর্ণা অপেরা" পার্টির অধিকারী—সেই মালাধর মল্লিকের তিনি চরম সর্বনাশ করেছিলেন। সেই মর্মান্তিক আঘাতের পর মালাধর আর একটা বছরও বাঁচেনি।

মালাধরের ছিল একটিমাত্র মেয়ে—মল্লিকা। অভিনেতা প্রভাস ঘোষ ভালবাসার অভিনয়ে সেই মল্লিকাকে মধুহীন করে এঁটো পাতার মতন পথে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন তার সমাসন্ন মাতৃত্বের কালে। এতটুকু বাধেনি তাঁর সেদিন। এতটুকু কৃতজ্ঞতা অথবা মমতা জাগেনি তাঁর মনে সেই পিতা আর দুহিতার জন্যে।

মল্লিকা আজ লোকবধু।

অনেকে বলে—অচিনকুমার নাকি সেই মল্লিকারই ছেলে।

তাঁর নিজেরই নয়তো?

আবার শিউরে উঠেন প্রভাস ঘোষ।...

সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

যাত্রাজগতে নট-দিবাকরও।

এবার উঠতে হবে প্রভাস ঘোষকে। যেতে হবে স্টেশনে।

স্টেশন!...

প্রভাস ঘোষের সেই স্টেশন কোথায়? আরও কতদূর গো?

বেতো ঘোড়াটা অত পথ পাড়ি দিতে পারবে তো?...

মধুময়কে শেষকথা বলেছিল নটদিবাকর : পালাও মাস্টার, পালাও! এই বহুরূপীর আখড়ার ভেক নিওনা নাট্যকার! চিরটাকাল সবার মুখে হাসি ফুটিয়ে শেষের দিনে তোমার দুঃখে কাউকে পাশে পাবে না। পালাও.....

—o—